GOVERNMENT OF INDIA.

NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

Class No. 182 Jd.

Book No. 898.4.

N. L. 38.

MGIPC—S8—16 LNL/53—12-1-54—25,000.

কঃ পন্থাঃ।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম. এ., বি. এল. প্রণীত।

[সাবিত্রী লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইবার পর
পরিবর্দ্ধিত হইল]

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত
মেডিকেল লাইব্রেরী
২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৮৯৮।

IMPERIAL LIBRARY
30. NOV. 04

Calcutta:

PRINTED BY R. DUTT,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

NATIONAL LIBRARY
No. Imp-4488
DATE 14/XI/09
CALCUTTA

কঃ পন্থাঃ ?

বহু সহস্র বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে একবার এই প্রশ্ন শুনা গিয়াছিল।

দ্বৈতবনে পঞ্চ পাণ্ডব তৃষ্ণায় কাতর। অরণ্যে এক সরোবর—যক্ষ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও রক্ষিত। জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় নকুল, সহদেব, অর্জ্জুন, ভীম একে একে সরোবরে গমন করিয়া যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জলপান করিবার জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির তথায় গমন করিলে যক্ষ তাঁহাকেও বলিলেন—আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জল পান করিলে তোমাকেও মরিতে হইবে। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন শুনিতে চাহিলেন। যক্ষ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি প্রশ্ন হইল। সকল গুলিই ধর্ম্ম ও অন্যান্য সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধীয়। যুধিষ্ঠির সকল প্রশ্নেরই সদুত্তর প্রদান করিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ বলিলেন—এখন তোমার

ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত হইবে। যুধিষ্ঠির আপন সহোদর ভীম কি অর্জ্জুনের প্রাণভিক্ষা না করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের জীবন ভিক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন—"ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন; এবং তাঁহারে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অতএব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, এবং ধর্ম্মও যেন আমারে পরিত্যাগ না করেন। কুন্তী ও মাদ্রী ইহাঁরা আমার জননী; উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন, এই আমার অভিলাষ। আমার পক্ষে উভয়েই সমান; অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।"* অধিকতর প্রীত হইয়া যক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ ভরত-কুলশিরোমণির চারি ভাইকেই পুনর্জীবিত করিলেন। যে সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া যুধিষ্ঠির ভরতবংশধর-দিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন কঃ পন্থাঃ তাহারই অন্যতম। সে প্রশ্নের তিনি এই মীমাংসা করিয়াছিলেনঃ—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োবিভিন্না
নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্যতত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

* কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, বনপর্ব্ব, ৩১২ অধ্যায়।

অর্থাৎ

তর্কের স্থিরতা নাই; বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার; মুনি একজন নহেন যে তাঁহার মতই প্রমাণ করিব; আর ধর্মের তত্ত্বও অজ্ঞানগুহায় বিলীন হইয়াছে; অতএব মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথই পথ।*

যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু যে প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মপুত্র ভরতকুল রক্ষা করিয়াছিলেন, যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিলে ভরতবংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নির্ম্মূল হইয়া যাইত, এত দিনের পর ভারতে আবার সেই গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই প্রশ্ন যুধিষ্ঠিরের নিকট যক্ষ উপস্থিত করিয়াছিলেন, আমাদিগের নিকট যক্ষ উপস্থিত করেন নাই—ভারতে ইউরোপীয় সভ্যতার আগমনে উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের পথ ঠিক না ইউরোপের পথ ঠিক, আমাদিগকে এই কথার মীমাংসা করিতে হইবে। ইহার ঠিক মীমাংসা করিতে পারিলে আমরা বাঁচিব—জীবরূপেও বাঁচিব, মনুষ্যরূপেও বাঁচিব; না পারিলে আমাদিগকে মরিতে হইবে—জীবরূপেও মরিতে হইবে, মনুষ্যরূপেও মরিতে হইবে। যক্ষের প্রশ্নে যে ফলাফল সংযুক্ত হইয়াছিল, আমাদের নিকট যে প্রশ্ন উপস্থিত তাহাতেও সেই ফলাফল

* কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, বনপর্ব্ব, ৩১২অধ্যায়।

সংযুক্ত আছে। সুতরাং প্রশ্ন বড় কঠিন, প্রশ্ন বড় গুরুতর। কিন্তু যতই কঠিন হউক, ইহার মীমাংসায় উদাসীন হইলে আমাদিগকে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে—এবং পাপগ্রস্ত হইলেই মরিতে হইবে।

ভারতের পথ ও ইউরোপের পথে প্রভেদ এই যে ভারত ইহলোককে পরলোকের সম্পূর্ণ অধীন করিয়া চলেন, ইউরোপ পরলোককে বহুল পরিমাণে ইহলোকের অধীন করিয়া চলেন। কি ভারত কি ইউরোপ সর্ব্বত্রই ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহলোক অপেক্ষা পরলোকের প্রয়োজনীয়তা অধিক, গৌরব বেশী। কিন্তু ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে ইহলোক পরলোকের সম্পূর্ণ অধীন; ইউরোপের কর্ম্মক্ষেত্রে পরলোকই ইহলোকের অধীন। এই প্রভেদের অর্থ এই যে জীবনযাত্রায় ভারতের যে পথ ইউরোপের পথ তাহার বিপরীত। ভারতের পথ ও ইউরোপের পথ পরস্পর বিরোধী। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—কঃ পন্থাঃ? পথ কি? ভারতের পথই পথ, না ইউরোপের পথই পথ?

অগ্রে পরলোক বা পরকালের দিক্ হইতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা এই যে ইহকাল সঙ্কীর্ণ, পরকাল সুবিস্তীর্ণ; ইহকাল অপেক্ষা পরকালের গুরুত্ব অনেক অধিক; ইহকাল পরকালের উদ্দেশেই অতিবাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। পরকালের গুরুত্ব সম্বন্ধে সকল ধর্ম্ম-

শাস্ত্রেরই এক মত। অতএব ভারত ইহকালকে পরকালের অধীন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ঠিক পথ ধরিয়াছেন, পরকালকে ইহকালের অধীন করিয়া ইউরোপ ঠিক পথ ছাড়িয়াছেন। কিন্তু পরকালের গুরুত্ব সম্বন্ধে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মত এক হইলেও, উহার প্রকৃতি সম্বন্ধে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মত এক নহে। কোন্ শাস্ত্রের কি মত, অবগত হওয়া আবশ্যক। কারণ পরকালের প্রকৃতি ভেদে পথের প্রভেদ হওয়া সম্ভব। যদি দুই জনের মধ্যে একজনকে মরিয়া পিশাচ হইতে হয়, আর একজনকে মরিয়া দেবতা হইতে হয়, তাহা হইলে পরকালের নিমিত্ত দুইজনের এক পথে চলিবার প্রয়োজন হয় না। হিন্দুদিগের পরকালের প্রকৃতি বিবেচনায় তাহাদের জীবন যাত্রার পথ কিরূপ হওয়া আবশ্যক অগ্রে তাহাই দেখিব।

মোটামুটি বলিতে গেলে দুইটী মতানুসারে হিন্দুদিগের পরকাল সম্বন্ধে শেষ কথা নির্ণীত হয়—অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে মানুষকে জীবধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মে পরিণত বা ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইতে হইবে। এই প্রকাশ বা পরিণতির অর্থ—জীবের বিশাল জড়ত্ব এবং সেই জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত বিষম মোহ ভোগাসক্তি প্রভৃতির বিনাশ হেতু ব্রহ্মত্বের বিকাশ। মোহ, ভোগাসক্তি, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, পার্থিবতাপ্রিয়তা প্রভৃতি কাহাকে বলে, সকলেই জানেন। ঐ গুলি কত প্রবল,

মানুষের উপর ঐ সকলের অধিকার কেমন দৃঢ়, ঐ গুলির দমন, বিনাশ বা পরিহার কত কঠিন তাহাও সকলে জানেন। ঐ গুলিকে পরিহার বা দমিত করিবার কত চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে তাহাও বোধ হয় অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহা মানুষের জীবধর্ম্ম। আবার মানুষ যে সকল পদার্থে পরিবেষ্টিত, মানুষকে যে সকল পদার্থ লইয়া থাকিতে হয়, মানুষকে যাহা খাইতে, পরিতে, দেখিতে, শুনিতে হয় সে সকলই মোহবর্দ্ধক, ভোগাসক্তিবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা-বর্দ্ধক, ইত্যাদি। অতএব ভিতর বাহির দুই দিক হইতেই মানুষ পার্থিবতার বিষম আকর্ষণে আকৃষ্ট, পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন ও অভিভূত। এমন যে মানুষ অদ্বৈতবাদানুসারে তাহার মর্ত্ত্য জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ, আপনাকে কামনা, বাসনা, মোহ, ভোগাসক্তি প্রভৃতি জীবলক্ষণ পরিশূন্য ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দ করিয়া তোলা, অর্থাৎ, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ডাধিকপরিমিত ব্যবধান তাহা বিনষ্ট বিলুপ্ত করা। সে ব্যবধান অসীম বলিলেই হয়। সেই অসীম ব্যবধান বিনাশ করিতে যে সময় আবশ্যক তাহাও এক রকম অসীম—যে সংযম, আত্মশাসন, সাধনা আবশ্যক তাহাও এক রকম অসীম। যে সময় আবশ্যক তাহাতে কত বর্ষ, কত জন্ম, কত যুগ চলিয়া যাইতে পারে তাহা নির্ণয় করা যায় না। যে সংযম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক তাহা কত কষ্টকর, কত কঠিন, কত কঠোর হওয়া আবশ্যক

তাহাই বা কে বলিতে পারে ? সে সময়েরও সীমা নাই ; সে কষ্ট, কঠিনতা, কঠোরতারও সীমা নাই। জন্মের পর জন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ কঠোর সাধনা করিয়া যাইতে হইবে, তথাপি বোধ হয় পথ ফুরাইবে না। সে পথের কষ্টই বা কত। পথের এ পাশে ও পাশে মোহন দৃশ্য, মোহন স্বর, মোহন মূর্ত্তি, মোহন মোহ। অ-হ-হ, কি কষ্ট ! মোহাচ্ছন্ন মানুষ, তাহার কি কষ্ট ! তাই কি কাহারো, তাই কি কোথাও, একটু দয়ামায়া একটু কৃপা করুণা আছে * যে একটী যবপরিমিত পথ, একটী মুহূর্ত্ত পরিমিত কাল কমিয়া যাইবে। যাঁহাতে মিশিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—মানুষে কণামাত্র জড়ত্ব থাকিতে আমি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিব না। কেহ যে মধ্যস্থ হইয়া, কেহ যে মুরুব্বি হইয়া পথ একটু কমাইয়া দিবে, কষ্টের একটু উপশম করিয়া দিবে, সে উপায় নাই, সে

* মানুষের প্রকৃতিই এই যে অনুরাগ সহকারে সে যাহার অনুধাবন করে তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে তাহার এইরূপ অনুভব হয়—অনুধাবনার ফলে অনুধাবন ক্রমে অধিকতর সহজ হয় বলিয়া এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ভগবানের অনুধাবন করিলেও তাঁহা দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছি, এইরূপ মনে হয়। ইহাকে যদি ভগবানের দয়া বা কৃপা করুণা বলা সঙ্গত হয় তবে তাঁহার দয়া বা কৃপা করুণা আছে, নচেৎ নাই। কারণ যাহারই অনুধাবন করা যায় তাহারই এরূপ আকর্ষণ আছে।

আশা নাই। যত পথ চলিতে হইবে সবই মানুষকে একাকী চলিতে হইবে; যত কষ্ট স্বীকার করিতে হউক, সবই মানুষকে একাকী সহ্য করিতে হইবে। ক্ষুদ্র জীব, কীটাণুকীট মানুষকে এই বিষম কষ্ট সহ্য করিয়া এই বিরাট পথ চলিতে হইবে।

দ্বৈতবাদীর মতে মানুষকে জীবধর্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ব্রহ্মে পরিণত হইতে হইবে না, পরমাত্মায় লীন হইতে হইবে না। তিনি বলেন, জীব চিরকাল ভগবান হইতে পৃথক থাকিবে, কখনই ভগবানে পরিণত হইবে না। অতএব মনে হইতে পারে যে পরকালতত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেক প্রভেদ—বিস্তর ব্যবধান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। পরকাল সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীর শেষ কথা ব্রহ্মে মিশ্রণ,* দ্বৈতবাদীর শেষ কথা ভগবানের সহিত মিলন। মিশ্রণ ও মিলন এক নহে। মিশ্রণে পার্থক্য নষ্ট হয়; মিলনে পার্থক্য থাকে, পার্থক্য না থাকিলে মিলন হয় না। যতক্ষণ পার্থক্য ততক্ষণই মিলন, পার্থক্য নষ্ট হইলেই মিশ্রণ। মিশ্রণ ও মিলনে যত প্রভেদ অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীতেও তত প্রভেদ বটে। কিন্তু দ্বৈতবাদীর যে মিলন—ভগবানের সহিত জীবের যে মিলন তাহাও বড় গূঢ় মিলন, বড় গাঢ় মিলন, বড় বিরাট মিলন। অনেক দ্বৈতবাদী বলেন—পৃথিবী ছাড়িয়া, স্বর্গ ছাড়িয়া,

* জলে জলের বা দুগ্ধে দুগ্ধের মিশ্রণের ন্যায় মিশ্রণ।

দেবলোক ছাড়িয়া, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ছাড়িয়া চিন্ময়, জ্ঞানময়, মধুময়, উল্লাসময়, রসময় গোলোকে উঠিয়া মানুষ চিন্ময়, জ্ঞানময়, মধুময়, উল্লাসময়, রসময়ের সহিত বড় গূঢ় গাঢ় গভীর মিলনে মিলিত হইবে। যাঁহার সহিত এই মিলন হইবে তিনি ব্রহ্মেরও উপরে—যে ব্রহ্ম পাইবার জন্য অদ্বৈত-বাদীকে কত জন্ম, কত কালের চেষ্টায়, ব্রতে, পূজায়, যজ্ঞে, জপে, তপে, ধ্যান ধারণায় মায়ামোহ জড়ত্বাদি ত্যাগ করিতে হয়—সেই ব্রহ্মেরও উপরে। অতএব অদ্বৈতবাদীর পরকাল সাধন যেরূপ কঠিন, যেরূপ বিরাট ব্যাপার দ্বৈত-বাদীর পরকাল সাধন তদপেক্ষা কম হইতে পারে না, বরং বেশীই হইবে। সচরাচর শুনা যায় যে ভগবানের সহিত দ্বৈতবাদীর মিলন প্রেমে হইয়া থাকে, সুতরাং তজ্জন্য অদ্বৈতবাদীর সাধনার ন্যায় দীর্ঘ কঠিন কঠোর সাধনা অনা-বশ্যক। কিন্তু যে প্রেমে জড়ত্ববিবর্জ্জিত চিন্ময়ের সহিত গূঢ় গাঢ় গভীর আধ্যাত্মিক মিলন হইবে জীবে পার্থিব কামনা বাসনা লালসা রাগ দ্বেষ প্রভৃতি জড় ধর্ম্মের লেশমাত্র থাকিতে সে প্রেমের উদ্রেক হইতে পারে না। লোক মধ্যে সচরাচর যে ভগবদ্ প্রেম দেখা যায় তাহা সে প্রেম নহে, দেখিতে তাহার অনুরূপ একটা নিকৃষ্ট ভাব মাত্র। অনেক সংযম সাধনা দ্বারা জীব আপন বিপুল জড়ত্ব ঘুচাইয়া প্রকৃত বৈরাগ্য ফলাইতে পারিলেই সে প্রেমের অধিকারী হইতে পারে। বৈরাগ্যবাদ কেবল অদ্বৈতবাদীর নয়,

দ্বৈতবাদীরও বটে। কিন্তু মায়ামোহাভিভূত, ইন্দ্রিয়াদি-তাড়িত মনুষ্যের পক্ষে বৈরাগ্য সুসাধ্য বা অনায়াসলভ্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর পরকাল সাধনা, প্রকৃত ফলপ্রসূ হইতে হইলে, কঠিন কঠোর ও বহুকাল ব্যাপী হওয়া আবশ্যক।*

যে ধর্ম্মশাস্ত্রে পরকাল এইরূপ কঠিন ব্যাপার তাহাতে ইহকাল পরকালের সম্পূর্ণ অধীন ও অনুবর্ত্তী হইবার কথা। পরকাল সাধনের জন্য যখন কত জন্ম, কত যুগ আবশ্যক তখন এজন্মে ইহকাল লইয়া থাকিলে চলিবে কেন? ইহ-কাল লইয়া থাকিবার যো কি? ইহকাল লইয়া থাকিবার অবসর কৈ? ইহকাল লইয়া থাকিলে ইহকালের মোহ এত বাড়িয়া যায় যে পরকাল আর মনে থাকে না। সুতরাং ইহকালকে পরকালের অধীন ও অনুগামী করিতেই হয়। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাও এই যে পৃথিবীতে থাকিয়া পার্থিবতা এক রকম পরিত্যাগ করিতে

* আমার এক আত্মীয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তেমন বৈষ্ণব আমি অল্পই দেখিয়াছি। কিন্তু পানে ভোজনে শয়নে সংযমে জপে তপে ধ্যানে সাধুজনোচিত বৈরাগ্যে তিনি অদ্বৈতবাদী যোগীর ন্যায় ছিলেন। তাঁহার সাধনা বড় কঠোর ছিল। তাঁহাকে কখন কীর্ত্তনে মাতিতে দেখি নাই। তাঁহার জপতপ এত অধিক ছিল যে বোধ হয় কীর্ত্তনে মাতিবার অবসরও তাঁহার ছিল না। তিনি সংসারী ছিলেন, সংসার পালনে উদাসীন ছিলেন না, কিন্তু সংসারের ভাবনায় কখন অভিভূত হইতেন না। যিন্নে নিস্পৃহ ছিলেন। তিনি সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আনন্দের কোলাহলময় অভিব্যক্তি ছিল না।

হইবে, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি যথোপযুক্তরূপে দমন করিয়া ভোগ-স্পৃহা, বিষয়তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত করিতে হইবে, জীব-ধর্ম্মমূলক সমস্ত কার্য্য—স্নান, পান, ভোজন, বিহার, বিলাস, শয়ন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য—পরকাল সাধনের অন্তরায় না হইয়া অনুকূল হয় এমন করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। নহিলে জীবধর্ম্মমূলক কার্য্য মানুষকে পরকাল ভুলাইয়া দিবে, পরকাল সাধনার বিষম ব্যাঘাত ঘটাইবে। আর মানুষ এই প্রণালীতে ইহকাল যাপন ও পার্থিব সুখ সম্ভোগ করিতে অক্ষম না হয় এই উদ্দেশ্যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্ম ভগবান বা ধর্ম্ম ছাড়া অপর সমস্ত পদার্থের অসারতা অকিঞ্চিৎকরতা ও অনিত্যতার কথা এত অধিক ও সুন্দর প্রণালীতে কথিত হইয়াছে যে হিন্দু পার্থিব পদার্থকে অসার অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া বর্ত্তমান ইউরোপের ন্যায় উহার অনুধাবনায় সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিয়োজিত করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে পর-কালের যেরূপ উচ্চ কল্পনাতীত প্রকৃতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে জীবন যাত্রার নিমিত্ত সেইরূপ দীর্ঘ দুরূহ পথও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই পথে চলিয়া চলিয়া উহা হিন্দুর এত প্রিয় ও প্রীতিকর হইয়াছে যে এখন অনেকে বলিয়া থাকেন যে ও পথের এত পক্ষপাতী না হওয়াই হিন্দুর পক্ষে শ্রেয় ছিল। ও পথের এত পক্ষপাতী হইয়া হিন্দু পার্থিব সুখ সম্পদ শক্তি সাম্রাজ্য স্বাধীনতা সমস্ত হারাইয়া

বড়ই হীন ও হেয়, এমন কি মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে। এ কথার বিচার এস্থলে হইতে পারে না। এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে হিন্দুর পরকালতত্ত্বে যাহার বিশ্বাস আছে হিন্দুর পথ ভিন্ন অন্য পথ তাহার নাই। সে পথ তাহার অপরিহার্য্য। সে পথে গেলে যে পার্থিব শক্তি সামর্থ্য অভাবাদি সম্বন্ধে উদাসীন হইতে হয় হিন্দুশাস্ত্রের এমন বিধান নয়। ঐ শাস্ত্রে রাজ্যপালন, রাজ্যরক্ষা, বাণিজ্যাদি দ্বারা ধন বৃদ্ধি, জীবিকা উপার্জ্জন প্রভৃতি ঐহিক শৃঙ্খলা সমৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ ও ব্যবস্থা আছে। বস্তুতঃ বর্ণভেদ, বর্ণভেদানুসারে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে অধিকার ভেদ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা ঐ সকল ব্যবস্থারই পরিপোষক। হিন্দু যদি ঐ সকল ব্যবস্থা সম্যক্ পালন না করিয়া পার্থিব শক্তি সম্পদাদি হারাইয়া থাকে, সে দোষ হিন্দুশাস্ত্রেরও নয়, হিন্দুশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পারলৌকিক পথেরও নয়, হিন্দুর শাস্ত্রার্থ না বুঝিবার বা বিস্মৃত হইবার দোষ। তবে যদি বল যে পার্থিব পথকে প্রধান করিলে পরলোকের প্রতি যেমন ঐকান্তিক ঔদাসীন্য হইয়া পরলোক হারাইয়া ফেলা একরকম অনিবার্য্য, পারলৌকিক পথকে প্রধান করিলে পৃথিবীর প্রতি তেমনই ঐকান্তিক ঔদাসীন্য হইয়া পৃথিবী হারাইয়া ফেলাও একরকম অনিবার্য্য—তাহা হইলে বরং এরূপ বুঝা ভাল যে পরকালের জন্য ইহকালের সর্ব্বনাশ বিধাতার বিধান, তথাপি এমন সংস্কার ভাল নয়

যে ইহকালের জন্য পরকালের সর্ব্বনাশ করা মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয় বা গৌরবের কার্য্য। যদি মরিতেই হয় তবে পরকাল লইয়া মরা অপেক্ষা ইহকাল লইয়া মরায় মনুষ্যের অনিষ্ট অপমান ও অগৌরব অনেক অধিক। হিন্দুর পরকালের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়াও দেখা গেল যে ইহকালকে পরকালের সম্পূর্ণ অধীন ও অনুবর্ত্তী করিয়া তিনি ঠিক পথই ধরিয়াছেন।

এইবার ইউরোপের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। মোটামুটি বলিতে গেলে, তথায় পরকাল ইহকালের অধীন। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পরকালের যেরূপ প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপেরও ভারতের ন্যায় ইহকালকেই পরকালের অধীন ও অনুবর্ত্তী করা কর্ত্তব্য। খৃষ্টধর্ম্মে যাহাকে মুক্তি বলে তাহা লাভ করিবার জন্য সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। মানুষকে নিষ্পাপ করিবার জন্যই যীশুখৃষ্ট জগতে আবির্ভূত হইয়া আপন জীবন বলি দিয়াছিলেন। ও কথার অর্থ এই যে মানব প্রকৃতিতে যে পাপের বীজ নিহিত আছে, যীশুখৃষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া অন্তরের অন্তরে বিশ্বাস করিলে তাহা বিনষ্ট হইয়া মানুষ নিষ্পাপ হয় এবং নিষ্পাপ হইলে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহারই পাপতাপাদিপরিশূন্য স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন ভাবিয়া দেখ নিষ্পাপ হওয়া কি কঠিন, কি বিষম ব্যাপার।

মায়ামোহাভিভূত, ইন্দ্রিয়াদিতাড়িত, সুখভোগাভিলাষী, লুব্ধ মুগ্ধ বাসনানলদগ্ধ মানুষের সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া এক রকম অসম্ভব ও অসাধ্য বলিলেই হয়। কিন্তু খৃষ্টানের যদি আপন পরকালতত্ত্বে প্রকৃত বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে তাহাকে সেই অসাধ্য সাধনই করিতে হইবে। তাহার শাস্ত্রে সেই অসাধ্য সাধনের একটী প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা আর কিছুই নয়, যীশুখৃষ্টে সম্পূর্ণ বিশ্বাস। অর্থাৎ যীশু খৃষ্ট নিজে যাহা ছিলেন তাহাই হওয়া, তিনি যাহা হইতে বলিয়াছেন তাহাই হওয়া। তিনি নিজে ছিলেন সন্ন্যাসী — তাঁহার পার্থিব বাসনা, পার্থিব কামনা, পার্থিব ভোগস্পৃহা কিছুই ছিল না। তিনি মানুষকে হইতেও বলিয়াছিলেন সন্ন্যাসী। তিনি মানুষকে সংসারী হইতে নিষেধ করেন নাই, কিন্তু সংসারী মানুষকে সন্ন্যাসী হইতেও বলিয়াছেন। Take no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself—কালিকার ভাবনা ভাবিও না, কারণ কাল যাহা চাই কালিকার দিনই তাহার ভাবনা ভাবিবে, তোমাকে তাহার ভাবনা ভাবিতে হইবে না (মেথিউ ৬—৩৪)। ইহা তাঁহারই কথা। ইহা মানুষকে সংসারে মজাইবার উপদেশ নহে, মানুষকে সংসারে রাখিয়া সন্ন্যাসী করিবার উপদেশ। অতি সামান্য হিন্দুর মুখেও এই রকম কথা শুনা যায়। কারণ হিন্দুশাস্ত্রকার সমস্ত হিন্দুকে সংসারে

রাখিয়াও সন্ন্যাসী করিয়া ফেলিয়াছেন। যীশু খৃষ্টে প্রকৃত বিশ্বাস করিতে হইলে, যীশু খৃষ্টকে ধরিয়া সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইতে হইলে খৃষ্টানকে হিন্দুশাস্ত্রকারের হিন্দু হইতে হয়। আবার খৃষ্টানের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে মানুষের নিষ্পাপ হওয়া অপেক্ষাও একটী উচ্চতর ও কঠিনতর কার্য্য আছে। যীশুখৃষ্ট মনুষ্যকে বলিয়াছেন—Be ye therefore perfect, even as your Father, which is in heaven, is perfect—তোমাদের স্বর্গবাসী পিতা যেমন পূর্ণ তোমরাও তেমনি পূর্ণ হও (মেথিউ, ৫—৪৮)। মানুষকে পরমেশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হইতে বলাও যা পরমেশ্বরের প্রকৃতি লাভ করিতে অথবা পরমেশ্বরে এক রকম পরিণত বা লীন হইতে বলাও তাই। খৃষ্টান হিন্দুর ন্যায় লয়বাদী না হইলেও কতকটা লয়বাদী বটে। পরকালের প্রকৃতি হিন্দুর শাস্ত্রেও যেরূপ খৃষ্টানের শাস্ত্রেও কিয়ৎপরিমাণে সেইরূপ। হিন্দুর ব্রহ্মে ও খৃষ্টানের পরমেশ্বরে অনেক প্রভেদ আছে সত্য। হিন্দুর ব্রহ্ম নির্গুণ, খৃষ্টানের পরমেশ্বর সগুণ। হিন্দুর ব্রহ্ম অসীম, খৃষ্টানের পরমেশ্বর সসীম। খৃষ্টানের পরমেশ্বর মনুষ্য হইতে যত উচ্চ, হিন্দুর ব্রহ্ম মনুষ্য হইতে তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ। মনুষ্য ও হিন্দুর ব্রহ্মের মধ্যে যত ব্যবধান, মনুষ্য ও খৃষ্টানের পরমেশ্বরের মধ্যে ব্যবধান তদপেক্ষা অনেক

কম। খৃষ্টানের ধর্ম্ম শাস্ত্রেইত লিখিত আছে, God made man in his own image, পরমেশ্বর মনুষ্যকে আপনার মতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টানের পরমেশ্বর হিন্দুর ব্রহ্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও তাঁহার প্রকৃতি লাভ করা বড় সহজ নয়। নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ কতকগুলি দোষশূন্য হওয়া মাত্র। কিন্তু তাহাতেই কিরূপ সাধনা, কত পার্থিবতা পরিহারের প্রয়োজন তাহা মোটামুটি বুঝিয়া দেখা হইয়াছে। পূর্ণ হওয়ার অর্থ কতকগুলি দোষ পরিহার ছাড়া কতকগুলি সদ্‌গুণের পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী হওয়া। সুতরাং পরমেশ্বরের ন্যায় পূর্ণ হওয়া কি কঠিন, কি অলৌকিক ব্যাপার অতি বড় ভাবুকও বোধ হয় তাহা ভাবিতে গেলে বিহ্বল হইয়া যায়।

দেখা গেল যে ইউরোপের পরকালের প্রকৃতি ভারতের পরকালের প্রকৃতি হইতে ভিন্ন হইলেও ঐ পরকাল সাধনার নিমিত্ত ইহকালকেই পরকালের সম্পূর্ণ অধীন ও অনুবর্ত্তী করা আবশ্যক। যেখানে সে সাধনা সেখানে পৃথিবী বা পার্থিবতা লইয়া থাকিবার অবসর পাওয়া যাইতেই পারে না, ভারতের ন্যায় পরকালকে প্রধান ও প্রভাবশালী করিতে হয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রচারের পর হইতে ইউরোপের ইতিহাসে যাহাকে মধ্যযুগ কহে সেই মধ্যযুগ পর্য্যন্ত খৃষ্টান ইউরোপ এক্ষণকার অপেক্ষা পরকালকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। তখন খৃষ্টান ইউরোপ

পরকাল লইয়া বেশী থাকিতেন, খৃষ্টান ইউরোপে তখন পূজা অর্চ্চনা উপাসনা আরাধনা দান ধ্যান জপ তপ তীর্থদর্শন প্রভৃতি বেশী বেশী পরিমাণে হইত, তখন খৃষ্টান ইউরোপে ভক্ত সাধু সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী মঠবাসী মঠবাসিনীর সংখ্যা এক রকম অসংখ্য ছিল। প্রত্যুত খৃষ্টান ইউরোপের ধর্ম্মশাস্ত্রে পরকালের প্রকৃতি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে খৃষ্টান ইউরোপের সেই রূপই হওয়া উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু ইউরোপ পূর্ব্বে যাহাই করিয়া থাকুন, ইদানীং ইহকালকেই প্রধান এবং পরকালকে ইহকালের অধীন করিয়াছেন। সুতরাং ইউরোপের পরকালের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে পরকালকে ইহ-কালের অধীন করিয়া ইউরোপ ঠিক পথ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ইউরোপ সত্য সত্যই কি ইহকালকে প্রধান করিয়াছেন? করিয়াছেন বৈ কি? ইউরোপের রাজ্য লালসার তৃপ্তি নাই। ইউরোপীয়দিগের রাজ্য বিস্তারের কত প্রয়াস, কত চেষ্টা, কে না দেখিতেছে। ইংলণ্ডের রাজ্যের ত সীমা নাই বলিলেই হয়। পৃথিবীর এমন খণ্ড নাই যেখানে ইংলণ্ডের রাজ্য নাই। তথাপি ইংলণ্ডের রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা চলিতেছে। রাজ্য বিস্তারের জন্য ফ্রান্স এক সময়ে বিরাট চেষ্টা করিয়াছিলেন—সমস্ত ইউরোপ তচ্‌নচ্‌ করিয়াছিলেন—ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সমরানল আনিবার সঙ্কল্প

করিয়াছিলেন। সে বিরাট চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াও ফ্রান্সের ভূমি তৃষ্ণা মিটে নাই। ফ্রান্স এখনও আশিয়া ও আফ্রিকায় রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। ইতালী অনেক দিন আপনাকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন। এখন যেমন ঘরে একটু ব্যবস্থা হইয়াছে অমনি বাহিরে রাজ্য লাভের চেষ্টা করিতেছেন। বিসমার্কের পূর্ব্বে জর্ম্মণি ছিল না বলিলেই হয়। বিসমার্ক যেমন জর্ম্মণি গড়িলেন, জর্ম্মণি অমনি আফ্রিকায় জমি-জারাত খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। সম্প্রতি আবার চীন অঞ্চলে গিয়াছেন এবং হিস্পানীয় ও আমেরিকাবাসীদিগের যুদ্ধ উপলক্ষে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে কিছু পান, বোধ হয় মনে মনে সে অভিপ্রায়ও রাখিতেছেন। ইউরোপের রাজ্যলালসা, ভূমি-তৃষ্ণা কমিতেছে না, বাড়িতেছে।

তাহার পর ইউরোপের অর্থলালসা। এই অর্থলালসার জন্যই ইউরোপ বাণিজ্য লইয়া উন্মত্ত। এমন বাণিজ্য পৃথিবীতে কেহ কখনও দেখে নাই। এ বাণিজ্যের বিস্তৃতি, বিপুলতা, বিশালতার কথা ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। এ বাণিজ্যে কত লোক ব্যাপৃত ও ব্যতিব্যস্ত, কত মানসিক শারীরিক ও যান্ত্রিক শক্তি বিনিয়োজিত, কত লোভ লালসা আশা দুরাশা আকাঙ্ক্ষা দুরাকঙ্ক্ষা দুর্নীতি দুরভিসন্ধি নিহিত তাহার সীমা নাই। এই বাণিজ্যের জন্য কত নির্দ্দোষ নিরীহ লোকের সুখ স্বস্তি ঘুচিয়া যায়, কত পরাক্রান্ত জাতি পদদলিত হয়, কত স্বাধীন জাতি পরাধীন হইয়া পড়ে। এই বাণিজ্যের

নিষ্ঠুর বিকট ব্যগ্রতায় কত লোক জীবন হারায়, কত লোক নিরন্ন হয়, কত লোক খাইবার সময় খাইতে পায় না, ঘুমাইবার সময় ঘুমাইতে পায় না, ভগবানকে ভাবিবার সময় ভজনালয়ে যাইতে পায় না। এই বাণিজ্যের জন্য ইউরোপের দিবারাত্রির মধ্যে বিশ্রাম নাই; নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই; বিপদকে বিপদ জ্ঞান করিবার যো নাই; হিমময় মেরু প্রদেশ বল, অগ্নিময় মরু প্রদেশ বল, হিংস্র জন্তু সমাকুল বন প্রদেশ বল, অনুল্লঙ্ঘনীয় চিরতুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ বল, প্রাণ সংহারক বাষ্পপূর্ণ ভীষণ ভূগর্ভ বল, পৃথিবীতে অগম্য স্থান নাই। এই বাণিজ্যের জন্য ইউরোপ এই সসাগরা বসুন্ধরাটাকে যেন চালিয়া চষিয়া ফেলিতেছে, এই বহুবস্তু পূর্ণ পৃথিবীটাকে যেন ভীমকায় অসুরের ন্যায় নিঙ্‌ড়াইয়া লইতেছে। বাণিজ্যের মোহে ইউরোপ অভিভূত। বাণিজ্যের নেশায় ইউরোপ উন্মত্ত।

ইউরোপের একটা বড় সহরে যাও—দেখিবে সমস্ত পৃথিবী যেন সেইখানে আসিয়া স্তূপীকৃত হইয়াছে—আর সমস্ত সহরটা যেন দিবারাত্রি একটা বিষম হুলস্থূল কাণ্ডে কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া রহিয়াছে—সহরে সকল লোকই যেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে, অসংখ্য শকট অসংখ্য পথ বিকট নিনাদে নিনাদিত করিয়া যেন নক্ষত্র বেগে ছুটিয়াছে, কত দিকে কত রেল

গাড়ি ভীষণ বেগে দৌড়িতেছে, বড় বড় কলের রাশি রাশি ধোঁয়াতে মাথার উপরের আকাশটা যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—গাড়ির ভিড়, ঘোড়ার ভিড়, মনুষ্যনির্ম্মিত কলের ভিড়, কলের শব্দের ভিড়, আমদানির ভিড়, রপ্তানির ভিড়, বেচাকেনার ভিড়, দোকানের ভিড়, আর দোকানে পণ্য দ্রব্য ও বিজ্ঞাপনের ভিড়। দোকানের পর দোকান, তাহার পর দোকান, তাহার পর দোকান—সহরটায় দোকান বৈ বুঝি আর কিছুই নাই। আর যাহাদের এই সহর তাহারা বুঝি দোকান বৈ আর কিছু জানে না, আর কিছু বুঝে না। দোকানে দ্রব্যের সংখ্যা হয় না, দ্রব্য কত রকমের তাহার ঠিকানা নাই। আর সমস্তই কি সুন্দররূপে, কত প্রাণপণে সাজান—ওগুলা ত দোকান নয়—সাজে, সজ্জায়, চটকে, চাকচিক্যে, রঙে, আলোয় যেন এক একটা ইন্দ্রভুবন—মানুষ ঐগুলাতে না মজিলে, না মরিলে বাঁচে কৈ? আর ঐ ইন্দ্রভুবন গুলায় কত যে বিজ্ঞাপন তাহার নির্ণয় হয় না, কেমন বিচিত্র বিচিত্র বিজ্ঞাপন তাহা বলিয়া উঠা যায় না। এত বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপনগুলা এত উন্মত্ততাব্যঞ্জক যে ওগুলা কাঠে কাগজে বা পাথরে মুদ্রিত বা খোদিত না হইয়া যদি মানুষের চীৎকারে ব্যক্ত হইত তাহা হইলে দারিদ্র্য ও অত্যাচার নিপীড়িত কোটী কোটী নরনারীর যে অপরিমেয় যন্ত্রণাধ্বনি দিবা

নিশি মহাশূন্য পরিপূরিত করিতেছে সে চীৎকার সে ধ্বনি ছাপাইয়া উঠিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে চমকিত ও সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিত। সন্ত্রাসিত ব্রহ্মাণ্ড বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া ভাবিত, যাহারা এই ভীষণ চীৎকার করিতেছে তাহারা বুঝি মানুষ না হইবে, মানুষ ত এমন করিয়া দোকান বসাইয়া জিনিস বেচিয়া টাকা করিবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই এবং দিবারাত্রি উন্মত্ত হইয়া থাকিতেও পারে না। টাকার জন্য তাহারা আপন আপন দেশের ভিতর চীৎকার করিয়া ক্ষান্ত নয়। পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে তাহারা টাকার জন্য চীৎকার না করিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদপত্রে তাহারা তাহাদের পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেয়—শুনিয়াছি এইরূপ বিজ্ঞাপনে তাহারা প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে খরচ করিয়া ফেলে। আমরা তাহাদের দেশ হইতে এত দূরে রহিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমাদের কাছে আসিয়াও ভয়ানক চীৎকার করিয়া বেড়ায়। কলিকাতার রাস্তায় বাহির হও, দেখিবে দুইধারে বড় বড় অক্ষরে তাহাদের বিজ্ঞাপন লটকান রহিয়াছে--Brand's Essence of Beef, Fry's Concentrated Chocolate, Ayer's Hair-Restorer, Crosfield's Perfection Soap ইত্যাদি। এমন কি ট্রামগাড়িতে চড়িতে গিয়াও বোধ হয় দেখিয়াছ

উহার আশে পাশে সামনে পিছনে ভিতরে বাহিরে ছাদের উপর তেমনি বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন রহিয়াছে— Lipton's Hams, Jams and Stilton Cheese, "Lorne" Whiskey, Alloa Ale and Stout, ইত্যাদি। আবার সহর ছাড়িয়া রেলপথে যাও, দেখিবে সুদূর মফস্বলের ষ্টেশনে তেমনি বড় বড় অক্ষরে তাহাদের নানা জিনিসের বিজ্ঞাপন ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহারা এই রূপে পৃথিবীর সকল দেশের সকল স্থানেই তাহাদের বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া বেড়াইতেছে। তাহাতে তাহাদের শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই, বিশ্রাম নাই—তাহাতে তাহাদের উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, মত্ততা সকলই ভীষণতম। তুমি আমি অতি সামান্য ব্যক্তি—দুই পাঁচ জন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ভিন্ন তোমাকেই কি আর আমাকেই কি, কেহই জানে না, কেহই চেনে না। কিন্তু তুমিও মধ্যে মধ্যে ইউরোপ হইতে ডাকে বড় বড় মোড়ক পাইয়া থাক, আমিও পাইয়া থাকি। মোড়ক খুলিয়া তুমিও দেখিয়াছ আমিও দেখিয়াছি, ভিতরে উত্তম কাগজে নানা বর্ণে মুদ্রিত অতি মনোহর চিত্রাদি সম্বলিত তাহাদেরই বৃহৎ বৃহৎ বিজ্ঞাপন পুস্তক। সমস্ত পৃথিবীর লোকে এইরূপে তোমার আমার ন্যায় তাহাদের বিজ্ঞাপন পুস্তক পাইয়া থাকে। 'পৃথিবীর কোটী

কোটী মনুষ্যের মধ্যে কে কোথায় থাকে, বহু অনুসন্ধানে তাহার সংবাদ লইয়া তাহাদিগকে খরিদ্দার করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া হাতে পায় ধরিয়া সাধিতেছে। আবার ইদানীং দেখিতেছি তাহারা চলনশীল বিজ্ঞাপন চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে—মানুষকে বিজ্ঞাপনে মুড়িয়া, গাড়িতে বিজ্ঞাপন চড়াইয়া পথে পথে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় তাহারা তাহাদের সমস্ত রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা মন প্রাণ আত্মা এই কাজে মজাইয়া ফেলিয়াছে। অর্থ লালসায় তাহারা এই রূপই হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার পর ইউরোপের ভোগলালসা। ইউরোপের ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে এক সময়ে তথায় লোকে ধর্ম্ম লইয়া যেন একটু উন্মত্ত ছিল, ধর্ম্মচর্য্যার যথার্থ অনুরাগী ছিল। তখন ইউরোপে ধর্ম্মের এক প্রকার একাধিপত্য ছিল। তখন তথায় অনেক নরনারী সদাই পরকালের ভয়ে ভীত থাকিত, পরকালে সদ্‌গতি লাভের জন্য শশব্যস্ত থাকিত, ধর্ম্মযাজক প্রভৃতিকে ভয়ভক্তি করিত, উপাসনা আরাধনা জপতপ বার ব্রত তীর্থ দর্শনাদিতে বিলক্ষণ আসক্ত ছিল—তখন ইউরোপে কত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী ছিল, কত উদাসীন উদাসিনী ছিল, কত মঠধারী মঠধারিণী ছিল, কত কুমার কুমারী ছিল—তখন ধর্ম্মের জন্য সমস্ত ইউরোপ—রাজা হইতে দরিদ্র কুটীরবাসী

পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপ—উন্মত্তের ন্যায় মহোৎসাহে মহোল্লাসে ধর্ম্মযুদ্ধে জীবনবিসর্জ্জন করিত—তখন ইউরোপের প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিরা পর্য্যন্ত ধর্ম্মরাজ্যের অধিপতি পোপের অধীনতা স্বীকার করিত এবং তাঁহার অঙ্গুলি সঞ্চালন দৃষ্টে আপনাদিগকে পরিচালিত করিত। ফলতঃ তখন ইউরোপ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল, ইউরোপের পার্থিবভাব ধর্ম্মভাবের অধীন ছিল, ইউরোপের হাওয়টা যেন ধর্ম্মের হাওয়া ছিল—মেজাজটা যেন ধর্ম্মের মেজাজ ছিল। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে ইউরোপের সেই ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন ইউরোপের অনেক স্থানে পরকালের ভয়ভাবনা আর তত নাই—কোথাও একেবারেই নাই; ধর্ম্মযাজকের আদর যত্ন মান সম্ভ্রম নাই বলিলেই হয়, মামুলি রকম যৎকিঞ্চিৎ আছে মাত্র; অনেক স্থান হইতে পোপ উড়িয়া গিয়াছেন; তীর্থযাত্রা প্রায় ফুরাইয়াছে; জপতপ বারব্রত কুকাজ বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে; রাজা আর ধর্ম্মযাজকের শাসন মানেন না, ধর্ম্মযাজক রাজার ভৃত্য ও প্রসাদপ্রার্থী হইয়াছেন; ইউরোপে সে ধর্ম্মের হাওয়া যেন আর বহে না, তৎপরিবর্ত্তে তথায় পৃথিবীর হাওয়া বহিতেছে। তখনকার সেই অবিরাম পরকালের ভাবনা, সেই পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত প্রাণান্তকর প্রয়াস, সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত যন্ত্রণাময় ব্যাকুলতা, সেই রাত্রি দিনের

ধর্ম্মকথা, সেই অবিশ্রান্ত জপতপ ছাড়িয়া দিয়া ইউরোপ এখন পৃথিবী, পৃথিবীর সামগ্রী, পৃথিবীর সুখ লইয়া থাকা বেশী আনন্দজনক মনে করিতেছেন, বেশী আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন। উত্তম dinnerটী (খানাটী) যদি পেট ভরিয়া খাওয়া হইল, মদের মাত্রাটুকু যদি কম না হইয়া বেশ একটু বেশী হইল, চুরুটটীও যদি বাদ না পড়িল, কেশবিন্যাস ও বেশবিন্যাসে যদি হাল ফ্যাসনের ব্যতিক্রমের চিহ্নমাত্র না রহিল, নাচে যদি মনোমত রমণীটীর সহিত নৃত্য করা হইল, থিয়েটরে যদি কিঞ্চিৎ রঙ্গরস করা গেল, যেমন করিয়া হউক কিছু টাকা যদি হাতে আসিল, ইত্যাদি ইত্যাদি, আজিকার ইউরোপে অনেকে তাহা হইলেই চরিতার্থ। পৃথিবীটা পরম পদার্থ, পার্থিব পদার্থের তুল্য আর কিছুই নাই, পূর্ণমাত্রায় পার্থিব ভোগ হইলেই জীবন সার্থক—ইউরোপের অনেক স্থানে লোকের এখন এইরূপ ধারণা। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ও চিন্তাশীল লোকেও এইরূপ বুঝিতে ও বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছু দিন হইল ইংলণ্ডের Nineteenth Century নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে একজন খ্যাতনামা দার্শনিক যুদ্ধপ্রিয় ইংরাজ ব্যবহারাজীব লিখিয়াছিলেন যে creature comforts অর্থাৎ উত্তম খাদ্য, পানীয়, পরিধেয়াদি পাইলেই মানুষের সব পাওয়া হয়, আর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। পার্থিব ভোগের প্রতি ইউরোপের

দৃষ্টি এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে যে উহার ব্যাঘাত হইবার ভয়ে তথায় অনেক নরনারী আর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন না। খবরের কাগজে সময়ে সময়ে এমন সংবাদও লিখিত হয়—অমুক সুন্দরী এখন পূর্ণ যুবতী, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে এখন বিবাহ করিবেন না, কিছু দিন যৌবনটা ভোগ করিয়া বেড়াইবেন। ইউরোপের অনেক নরনারীই যে এখন, শুধু যৌবন কেন, সমস্ত জীবনটা ভোগ করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য উৎসুক সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সন্দেহ হইবেই বা কেন? ভোগের কথা তাহাদের মুখে এখন যে বড় সর্ব্বদা শুনা যায়। ভাল খানা জুটিয়াছে, উত্তমরূপে ভোগ কর; ভাল drink (সুরা) পাইয়াছ, উত্তমরূপে ভোগ কর; ভাল খাইয়া শরীরে শক্তি হইয়াছে, উত্তমরূপে ভোগ কর; তুই জন বন্ধু আসিয়াছে, উত্তমরূপে ভোগ কর; মেঘান্তে রৌদ্র উঠিয়াছে, উত্তমরূপে ভোগ কর; আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, উত্তমরূপে ভোগ কর; গাছে পাখী গাহিতেছে, উত্তমরূপে ভোগ কর; ঘোড় দৌড় হইতেছে, উত্তমরূপে ভোগ কর; জলপথে যাইতেছ উত্তমরূপে ভোগ কর; স্থলপথে যাইতেছ, উত্তমরূপে ভোগ কর;—ভোগ, ভোগ, ভোগ—ভোগ বড় বস্তু, ভোগেই ভাগ্য, ভোগের জন্যই মর্ত্ত্য ভুবন, আজ ইউরোপের মুখে এই কথা, সাহিত্যে

এই কথা, সংবাদ পত্রে এই কথা*। ইউরোপের বড় বড় কাজের, বড় বড় কথার অন্তরালে এই কথা। দুই শত বৎসর পরে হউক, দুই সহস্র বৎসর পরে হউক, দেখা যাইবে, এ বড় বিষম কথা, বড় বিপদের কথা। ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য ইউরোপে আজ কত খেয়ালই উঠিতেছে, কত খেয়ালই চলিতেছে। কেহ দুই দিনের পথ দশ ঘণ্টায় হাঁটিয়া মনে করিতেছেন, আমার জন্ম সার্থক হইল। কেহ ভাবিতেছেন, যদি বাইসাইকেলে চড়িয়া সমস্ত পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসিতে না পারিলাম তবে আর বাঁচিয়া সুখ কি? কেহ বলিতেছেন, লোকে বৎসরে যত চুরুট খায় তাহার পরিত্যক্ত খণ্ডগুলা এক লাইনে সাজাইলে লাইনটা কত লক্ষ

---

* ভোগ কথাটা এখন এখানেও স্থানে স্থানে শুনা যায়। অনেক ভাবুক ও ইংরাজীশিক্ষিত লোকেও বলিতেছেন যে মনুষ্যের যখন ভোগপ্রবণতা আছে তখন সে ভোগ না করিবে কেন? মানুষ ভোগ করিবে না এমন কথা কেহ বলে না। সময়ে সময়ে মানুষের আমোদ আহ্লাদেরও প্রয়োজন হয়, নহিলে শরীর থাকে না, মন অবসন্ন হয়। অনেকে শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে করিতে যেন আপন আপন অজ্ঞাতসারে এক একটা সুর ভাঁজিয়া ফেলে, অন্ততঃ তা-না-না-নাও করে। তাহাতে স্ফূর্ত্তি জনিত শক্তির অনুভব হয়। গুরুতর শ্রমঘটিত শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আমোদ আহ্লাদ আবশ্যক, একটু একটু ভোগের প্রয়োজন। সজ্জনাদির সহিত সংস্রবে যে আনন্দানুভব হয় তাহাতে স্বভাব চরিত্রেরও বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাতেই মানুষের ভোগপ্রবণতার সার্থকতা। কিন্তু ভোগপ্রবণতা আছে বলিয়া কেবল ভোগ সুখের জন্য ভোগ বা আনন্দে বিভোর হইবার জন্য আমোদ আহ্লাদ মনুষ্যোচিত নহে। ওরূপ ভোগ বা আমোদ মনুষ্যেতর জীবেরই উপযোগী ও স্বভাবসঙ্গত।

ক্রোশ হয়, হিসাব করিয়া না দেখিলে পৃথিবীটা চলে কেমন করিয়া ? এই প্রণালীতে এখন ইউরোপের অনেক নরনারী পৃথিবী ভোগ করিতেছেন, 'আপনাদিগকে আপনারা' ভোগ করিতেছেন। ইউরোপের সাহিত্য ক্ষেত্রেও এখন ভোগলালসার বড় উদ্দাম ভাব। কত অনিষ্টকর গ্রন্থ তথায় এখন প্রকাশিত ও পঠিত হইতেছে তাহার সংখ্যা হয় না। ঐ সকল বিষবৎ গ্রন্থপাঠে কত নরনারী উন্মত্ত তাহারও সংখ্যা হয় না। পাঠক কি প্রকাশক কাহাকেও নিষেধ করিবার যো নাই। পৃথিবীটাকে মনের সাধে ভোগ করিতে হইবে, 'আপনাকে আপনি' পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে হইবে, ইহাতে কেহ প্রতিবাদী হইতে পারিবে না—ইউরোপের এখন এই বাসনা, এই সঙ্কল্প। গ্রন্থে রাজদ্রোহিতা বা স্পষ্ট অশ্লীলতা না থাকিলে প্রকাশকের কাছে রাজশক্তিও শক্তিহীন—পাঠকের কাছে রাজশক্তির অস্তিত্বই নাই। ইউরোপে অন্যান্য অধ্যয়নও যে ভোগলালসা বা সুখ স্পৃহা শূন্য তাহা নহে। কিছু দিন হইল তথাকার একখানি প্রধান সংবাদপত্রে এই কথাটী লিখিত হইয়াছিল—

"That the operations of the intellect, in the proper sense of that much abused word, and after them the observation of the phenomena of nature afford the highest enjoyment of

which the human mind is capable, is a proposition which has been maintained in every clime and in every language" উৎকৃষ্ট বিষয় বা গ্রন্থাদির অধ্যয়নে যে সুখোদয় হয় তাহা বিশুদ্ধ বটে। কিন্তু ইউরোপে অধ্যয়নেও যে ভোগস্পৃহা আছে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। টাইম্‌স্‌ পত্রের লেখক যে বলেন, অধ্যয়নে ভোগস্পৃহা সকল দেশে এবং সকল ভাষায় দৃষ্ট হয়, ইহা ঠিক নহে। ভারতের অধ্যয়নে ভোগস্পৃহার কিছু মাত্র গৌরব নাই, বরং একটু অগৌরবই আছে। যাহার অধ্যয়নে তত্ত্বজ্ঞান, ধর্ম্মভাব, লোকচরিত্র, লোকহিত, সমাজনীতি প্রভৃতির উন্নতি হয় সংস্কৃত সাহিত্যে তাহারই স্থান অতি উচ্চ, তাহারই আদর গৌরব মর্য্যাদা বেশী, আর যাহার অধ্যয়নে প্রধানতঃ মনের সুখ বা আনন্দমাত্র হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার স্থান অনুচ্চ, তাহার গৌরব অপেক্ষাকৃত অনেক কম। বেদ, উপনিষদ, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, রাজনীতি প্রভৃতির যে গৌরব কাব্য নাটক উপন্যাসাদির সে গৌরব নাই*। ইউরোপীয় সাহিত্যে কিন্তু কাব্য নাটকাদিরই উচ্চতম স্থান। এ প্রভেদের একটী কারণ এই যে অধ্যয়নে ভারত ভোগ-

---

* মহাভারত ও রামায়ণের কথা স্বতন্ত্র। মহাকাব্য হইলেও ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই এই দুই গ্রন্থের এত গৌরব।

স্পৃহার অনুবর্ত্তী নহেন, ইউরোপ ভোগস্পৃহার অনুবর্ত্তী*। এইজন্য ইউরোপে voracious reader বা গ্রন্থগ্রাসকের এত প্রশংসা। আত্মার উন্নতির জন্য পড়া নয়, মনের উন্নতির জন্য পড়া নয়, চরিত্রের উন্নতির জন্য পড়া নয়, জীবিকার্থ পড়া নয়, লোকের হিত সাধন করিবার শক্তি সঞ্চয়ার্থ পড়া নয়, পড়িবার জন্য পড়া, পড়িবার নেশায় পড়া, পড়িবার সুখের জন্য পড়া, যা পড়িতে পাওয়া যায় তাই পড়া—এ পড়ায় প্রশংসা নাই, ইহা ভোগাভিলাষীর পড়া। কিন্তু ইউরোপে এ পড়ার প্রশংসা ধরে না। যে দেশের লোকের প্রকৃতির মূলে ভোগলালসা কেবল সেই দেশে love learning for its own sake, কেবল বিদ্বান হইবার জন্য বিদ্যানুরাগী হওয়া উচিত, এই উপদেশ মহদ্বাক্য বলিয়া গণ্য ও গৃহীত হয়। বিদ্যালাভ করিতে হয় ভগবানের সৃষ্টিরহস্য যতদূর সম্ভব বুঝিয়া তাঁহার ভক্ত হইবার জন্য, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, চরিত্রের উন্নতি করিবার জন্য, সর্ব্বভূতের হিতসাধন করিবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, শারিরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

* সৎকার্য্যমাত্রেরই ধর্ম্ম এই যে উহাতে সুখোদয় হয়। সুখোদয় হইলে উহার ভোগ অনিবার্য্য এবং তাহাতে দোষও নাই। কিন্তু সুখভোগের নিমিত্ত সৎকার্য্য করিতে নাই। করিলে উহার মহিমা নষ্ট হইয়া উহা এক রকম অপ-কর্ম্ম হইয়া পড়ে এবং যিনি সৎকার্য্য করেন তাঁহার চিত্তও কলুষিত ও অবনত হয়।

রক্ষার জন্য, ইত্যাদ। কিন্তু এরূপ কোন উদ্দেশ্য না রাখিয়া বা না সাধিয়া কেবল কতকগুলা কথা মনে ঠাসিবার জন্য মনটাকে বিদ্যায় ভরিয়া ফেলা কি রকম কাজ বুঝিয়া উঠা যায় না। যাহারা এই রকম করিয়া মনটাকে বিদ্যার বিপুল গুদাম করিয়া ফেলে ইউরোপে তাহাদের বড়ই প্রশংসা, অসীম সম্মান। তাহারা নাস্তিক হউক, দুশ্চরিত্র হউক, অহঙ্কৃত হউক, তাহাতে আসিয়া যায় না, তাহারা বিদ্যার বৃটিশ মিউজিয়ম—তাহাদের সম্মানের সীমা নাই, তাহারা বহুলোক পূজ্য। মনকে বিদ্যার গুদাম করিবার জন্য বিদ্যার অনুধাবনায় একটা তীব্র সুখ ও আনন্দ আছে—শিকারীর শিকারানুধাবনায় যেরূপ সুখ ও আনন্দ ইহাও সেইরূপ সুখ ও আনন্দ। ইউরোপে এইরূপ সুখস্পৃহা, এইরূপ ভোগলালসা প্রবল বলিয়া love learning for its own sake এই কথার তথায় এত মূল্য মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা।

ইউরোপে বালকদিগের নিমিত্ত এখন যে প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হইতেছে তাহা দেখিলেও পরিষ্কার প্রতীতি হয় যে পার্থিব ভোগ, সুখ, সুবিধাদির প্রতি তথায় অনেকের এখন অতি প্রখর দৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে উচ্চ নির্ম্মল উপদেশ প্রায়ই থাকে না, কেবল খাইবার, পরিবার, খেলাইবার, আমোদ করিয়া বেড়াইবার, খাদ্যপেয়াদি প্রস্তুত করিবার, কল

কারখানা প্রভৃতি চালাইবার কথাই অধিক থাকে। যেন তথায় বালককে বড় হইয়া খাওয়া পরা কল চালান ব্যবসাবাণিজ্য করা ভিন্ন আর কোন কাজই করিতে হইবে না। কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যও মানুষের পার্থিব অংশ লইয়া ব্যতি-ব্যস্ত—মানুষের দুই দণ্ডের আমোদপ্রমোদ আশা দুরাশা আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মান অভিমান অপমান গৌরব গরিমা উল্লাস নৈরাশ্য দ্বেষ হিংসা ভয় ভালবাসা প্রেম বিরহ বেদনা জ্বালা যন্ত্রণা প্রভৃতির কথায় প্রায় পরিপূর্ণ। ঐ সাহিত্য পড়িলে মনে হয় এই গুলাই বুঝি মানুষের সর্ব্বস্ব, এই গুলা আছে বলিয়াই বুঝি মানুষের কথা কহিতে হয় ও কহিতে লাগে ভাল। ইউরোপ এখন এই গুলাকে, এই 'humanities' গুলাকে আপন বিশেষত্ব বলিয়া নিজেই গৌরব করিয়া থাকেন এবং সাহিত্যে এই 'humanities' গুলাকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। সুতরাং ঐ সাহিত্য পড়িলে দুই দণ্ডের মানুষের জন্য হাসিতে হয়, কাঁদিতে হয়, রাগে জ্বলিয়া উঠিতে হয়, নানা রকমে বিচলিত বিকারগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু যে মানুষ মরিয়াও মরে না, যে মানুষ স্থূল দৃষ্টিতে অনিত্য, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিত্য সে মানুষ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, সে মানুষকে প্রায় ভুলিয়া যাইতে হয়। ইউরোপীয় সাহিত্যের মানুষ প্রায়ই স্থূল মানুষ—সে

মানুষের কথা অধিক পড়িলে মানব প্রকৃতিতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত আছে তাহার বিকাশের ব্যাঘাত হইবারই সম্ভাবনা। এমন কি, ঐ সাহিত্যের শিরোমণি সেক্সপিয়রের গ্রন্থাদি পাঠও বোধ হয় সকলের পক্ষে এবং সকল বয়সে নিরাপদ নহে। মানুষের পার্থিব কথা বেশী পড়িলে, অর্থাৎ মানুষের পার্থিব অংশ লইয়া অধিক থাকিলে, পাঠকের মোহাদি বর্দ্ধিত হইয়া তাহার পার্থিব ভাব বা প্রকৃতি তীব্রতর হইয়া উঠে, সুতরাং আধ্যাত্মিক ভাব বা প্রকৃতি বিকশিত হইবার পক্ষে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হয় *। এই জন্যই বোধ হয় সংস্কৃত সাহিত্যে মানুষের পার্থিব কথার সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা পারমার্থিক কথা প্রায়ই মিশ্রিত থাকে।

ইউরোপ বলেন তাঁহার পথই উন্নতির পথ, ভারতের পথ অবনতির পথ। এবং ভারতে যাঁহারা ইউরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে বিবেচনা করেন যে ইউরোপের পথ উন্নতির পথ বলিয়া হিন্দুর অবলম্বনীয় এবং ভারতের পথ অবনতির পথ বলিয়া হিন্দুর পরিত্যজ্য। তাঁহারা ইহারই মধ্যে আপন

* অদ্বৈতবাদীর এই কথা ত বটেই। অপর কাহারও যে নয় এরূপ বিবেচনা করিবারও কারণ নাই। সকলের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

আপন জীবন যাত্রাতেও অল্পাধিক পরিমাণে ইউরোপের পথ অনুসরণ করিয়াছেন। এই জন্য, এত কালের পর, ভারতে আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে—কঃ পন্থাঃ ? ভারতে আবার এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে। যক্ষ যে অর্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন, আমাদের নিকট ইহা ঠিক সে অর্থে উপস্থিত হয় নাই সত্য। ধর্ম্মশাস্ত্রকার-দিগের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখিয়া যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মচর্য্যার্থ কোন্ পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে দুইটী মানব মণ্ডলীকে জীবন যাপনার্থ দুইটী পরস্পর বিরোধী পথে প্রবিষ্ট দেখিয়া দুইটী পথের কোন্‌টী ভাল আমাদিগের এই কথার মীমাংসা করার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু মীমাংসার ফলাফল উভয়ত্রই এক প্রকার। যুধিষ্ঠিরের মীমাংসার উপর পাণ্ডবকুলের জীবন্মৃত্যু নির্ভর করিয়াছিল—আমাদের মীমাংসার উপর শুধু আমাদের নয়, শুধু ইউরোপের নয়, বোধ হয় সমস্ত মানবকুলের জীবন্মৃত্যু নির্ভর করিবে।

ইউরোপের পথে উন্নতি হয় কি না বুঝিতে হইলে, উন্নতি কাহাকে বলে অগ্রে নিরূপণ করা আবশ্যক। নিরূপণ অতি সহজ। ইউরোপ যে পথই অবলম্বন করিয়া থাকুন, নিজেই বলিয়া থাকেন যে যাহাতে ধর্ম্মের অপলাপ

হয় বা স্বভাবের বিকৃতি বা অবিশুদ্ধতা ঘটে তাহাতে উন্নতি হইতে পারে না, অবনতি হয়। ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে এ কথা যে সর্ব্ববাদি সম্মত তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। লোভপরতন্ত্র হইয়া যে ঐশ্বর্য্যশালী হয় সে উন্নতি করিয়াছে, এমন কথা কেহ বলে না—তাহার ঘোর অধোগতি হইয়াছে, এই কথাই সকলে বলে। লোককে কুপথগামী করিয়া যে অর্থসঞ্চয় করে, সে উন্নতি করিয়াছে, এমন কথাও কেহ বলে না। অধোগতির জন্য সকলেই তাহার নিন্দা করে। যে কাজ করিলে ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি না হইয়া অধোগতি বা অবনতি হয়, সেই কাজ করিলে জাতি বিশেষের অধোগতি বা অবনতি না হইয়া উন্নতি হয় এমন কথা কোন শাস্ত্রে দেখি নাই, কোন যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেও পারি না। ইউরোপের রাজ্যবিস্তারে নৈতিক উন্নতির লক্ষণ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনার বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত, আপনার ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত, আপনার অন্নের ভাণ্ডার প্রশস্ত করিবার জন্য ইউরোপ অপরের দেশ লইয়া আপনার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এ প্রকারে ধনশালী বা বলশালী হওয়া প্রশস্ত নীতির অনুমোদিত নহে। অপরের দেশ লইয়া ইউরোপ তথায় অনেক মহৎ কার্য্য করিয়া থাকেন। অশিক্ষিতকে সুশিক্ষা দান করেন, অসভ্যকে সভ্যতা শেখান, কুশাসিতকে সুশাসনের সুখশান্তি সম্ভোগ করান। ইহাতে যথার্থই সেই সকল দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। সুসভ্য বিজেতা বিজিতের এইরূপ মহোপকার সাধন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহাতে বিজেতার মহা-

পুণ্য হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐশ্বর্য্য আধিপত্য প্রভৃতির লোভের বশীভূত হইয়া বিজেতা আপনার স্বভাবের যে বিকৃতি বা অপকর্ষ সাধন করেন, বিজেতার হিতার্থ মহাপুণ্য সঞ্চয় করিলেও তাহার প্রতিকার হয় না। সকলেই জানেন,আমাদেরই সমাজে এমন লোক আছেন যাঁহারা অর্থলোভে ধনোপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা অন্নদান,জলদান,দেবালয় স্থাপন প্রভৃতি নানা সৎ কার্য্য করিয়া থাকেন। সৎকার্য্যের জন্য তাঁহারা প্রশংসাভাজন বটে। কিন্তু অগ্রে লোভপরবশ হইয়া তাঁহারা আপনাদের স্বভাব বা প্রকৃতির যে বিকৃতি সাধন করেন, তাঁহাদের শত সৎ কার্য্যে তাহার সংশোধন হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপের পররাজ্য গ্রহণের পরিণামে পরোপকার প্রবৃত্তি বা পরার্থপরতা থাকিলেও, মূলে যখন নাই, তখন পররাজ্য গ্রহণ ইউরোপের উন্নতির লক্ষণ নহে, ঘোর অবনতি বা অধোগতির লক্ষণ।

বাণিজ্য ব্যবসায় ধন বৃদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কৃষিপ্রধান ভারতের শাস্ত্রকারেরাও এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইউ-রোপে অনেক সময়ে যে প্রণালীতে বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হয়,তাহা বিবেচনা করিলে উহাকে ধন বৃদ্ধির প্রশস্ত পথ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। ইউরোপের যে রাজ্য-বিস্তার এত দোষাবহ বাণিজ্যবিস্তারের ইচ্ছাই তাহার প্রধান কারণ। ঐ ইচ্ছা ইউরোপের ছোট বড় অনেকেরই মনে আজ অতিশয় বলবতী। ভারতবর্ষের শাস্ত্রকারদিগের মতে বাণিজ্য ধন সঞ্চয়ের প্রশস্ত পথ হইলেও সমাজের শীর্ষস্থানীয়দিগের অনবলম্বনীয়। হিন্দু সমাজপ্রণালীতে পণ্ডিত, ধর্ম্মযাজক,

শাস্ত্রবেত্তা,রাজপুরুষ, রাজা, যোদ্ধৃ পুরুষ ইহাঁদিগের বাণিজ্যে অধিকার নাই—ইহাঁদিগের পক্ষে বাণিজ্য অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা—অতি সূক্ষ্মদর্শী মহামনার ব্যবস্থা। বাণিজ্যের মূল ধনতৃষ্ণায়, বাণিজ্যের বৃদ্ধিতে ধনতৃষ্ণারও বৃদ্ধি। কিন্তু ধর্ম্মতৃষ্ণা, জ্ঞানতৃষ্ণা, প্রজারঞ্জন তৃষ্ণা প্রভৃতির সহিত তুলনায় ধনতৃষ্ণা নীচ তৃষ্ণা। প্রবল ধনতৃষ্ণা ঐ সকল উৎকৃষ্ট তৃষ্ণা নষ্ট বা হ্রাস করিয়া দেয়। পণ্ডিত, শাস্ত্রবেত্তা, রাজা, রাজপুরুষ প্রভৃতির মনে ধনতৃষ্ণা জন্মিলে বুঝিতে হয় যে সমাজের শিরোভাগ নীচতাভিমুখী হইয়াছে। ধনতৃষ্ণায় রাজা, রাজপুরুষ প্রভৃতি ব্যবসা বাণি-জ্যাদিতে লিপ্ত বা সংস্রবযুক্ত হইলে রাজ্যের শাসননীতি কলুষিত ও শাসনকার্য্য অবিচার অত্যাচারাদি নানা দোষে দূষিত হয়। ইউরোপে এখন রাজা, রাজকর্ম্মচারী, পণ্ডিত, ধর্ম্মযাজক, যোদ্ধৃপুরুষ সকলেই এক রকমে না এক রকমে বাণিজ্যে লিপ্ত। কোন কলের কারবারের বা ব্যবসায়ের শেয়র রাখেন না, ইউরোপের উচ্চশ্রেণীতে এমন লোকই এখন নাই। ইউরোপীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের বণিকবৃত্তি ইউরোপের উন্নতির লক্ষণ নহে, বড় ভীতিজনক অবনতির লক্ষণ।

ইউরোপের বণিক ও দোকানদারেরা পৃথিবীর ধন কুড়াইয়া লইবার অভিপ্রায়ে নানা কুকর্ম্ম করিয়া বহুতর লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। কল কারখানার সাহায্যে

সকল দ্রব্যই অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হয়। সুতরাং ইউরোপীয় বণিক ও দোকানদারেরা বিলাসের উপকরণনিচয়ও সস্তায় বিক্রয় করিয়া থাকে। যাহারা কস্মিনকালে চক্‌চকে জুতা, রঙ্গীন মোজা, ঝক্‌ঝকে গার্টার, প্লেটওয়ালা জামা, বিচিত্র বোতাম, বিবিধ বর্ণের সুবাসিত সাবান, সুন্দর আধারে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করেনাই তাহারাও এখন এই সমস্তের অধিকারী হইয়াছে। তাহারা দরিদ্র—সুতরাং বিলাস সস্তায় কিনিয়াও অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। অধিকতর দরিদ্রতা অপেক্ষা তাহাদের আরো গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে। বিলাসী হইলে শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যাহারা সস্তায় বিলাস কিনিতেছে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যত শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে পারিত ও লোভ সম্বরণ করিতে পারিত তাহারা তত পারে না। তাহাদের শরীর ও মনের বন্ধনী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহারা নানা মানসিক ও শারীরিক রোগে আক্রান্ত হইতেছে। তাহারা যথার্থই বিপন্ন। বর্ত্তমান ইউরোপের প্রধান কীর্ত্তি কল কারখানা। এমন কীর্ত্তি পৃথিবীর অন্য কোথাও কখন দৃষ্ট হয় নাই। কল কারখানার উপকারিতাও আছে। অল্প সময়ে অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করা কল কারখানা ভিন্ন অন্য উপায়ে হয় না। সুতরাং সকল দ্রব্যই কল কারখানার সাহায্যে অল্পব্যয়ে পাওয়া যায়। নিত্য ব্যবহারার্থ অপরিহার্য্য দ্রব্য অল্প মূল্যে পাইলে লোক সাধারণের প্রভূত উপকার

হয় বটে। কিন্তু যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার অপরিহার্য্য নহে, যে সকল দ্রব্যের ব্যবহারে লোকসাধারণে বিলাসী হইয়া শ্রমবিমুখ, ভোগাভিলাষী, অমিতাচারী ও অমিতব্যয়ী হয় সে সকল দ্রব্য সস্তা হইলে যে প্রকার অপকার হয় তদ্বিবেচনায় কলজাত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সুলভতা লোক সাধারণের মঙ্গলের কারণ বলিয়া মনেই হয় না। উপকার যাহা হয় তাহা কেবল অর্থ সম্বন্ধে, অপকার যাহা হয় তাহা কেবল অর্থ সম্বন্ধে নহে, শরীর মন স্বভাব চরিত্র মতি গতি বর্ত্তমান ভবিষ্যত ইহকাল পরকাল সমস্ত সম্বন্ধে। যে কল কারখানার জন্য ইউরোপের আজ এত প্রশংসা, ইউরোপ আজ পৃথিবীতে ধন্য, ইউরোপের পথের প্রতি এদেশের এত লোকের এমন পক্ষপাত সে কল কারখানা যেখানে সস্তাদরে বিলাস বেচিয়া অপকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে সেখানে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করিতেছে। বিলাসের ন্যায় মানুষের মনোহর শত্রু আর নাই। বিলাসের শত্রুতা ব্যর্থ হইয়াছে কোন দেশের পুরাণে বা ইতিহাসে এমন কথা দেখি নাই। পূর্ব্বে ভারতে বিলাস ছিল না এমন নহে—বিলাস ছিল, কিন্তু এত মহার্ঘ ছিল যে লোক সাধারণে তাহা ক্রয় করিতে পারিত না। এক খানা ভাল কাশ্মীরী শাল বোধ হয় হাজার টাকার কমে পাওয়া যাইত না; ইউরোপের নকল কাশ্মীরী ১২৲ টাকায় পাওয়া যাইতেছে। আবার ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রজাত

সংস্কার এই যে বিলাসে কোন বর্ণেরই অধিকার নাই এবং বর্ণভেদজাত সংস্কার এই যে অল্প স্বল্প বিলাস যদি কাহারও সম্বন্ধে মার্জ্জনীয় হয় সে কেবল রাজারাজড়ার ন্যায় দুই চারিজনের সম্বন্ধে, শ্রমজীবী প্রভৃতির ন্যায় নিম্ন বর্ণের সকল লোক সম্বন্ধেই বিলাস যার পর নাই গর্হিত ও নিন্দনীয়। এই সকল কারণে ভারতে এক একটা লোক বা এক একটা বংশ বিলাসিতায় মরিয়াছে, কিন্তু কোন একটা জাতি বা সমাজ বিলাসিতায় মরে নাই। ইউরোপে কত রাজ্য বিলাসিতায় উৎসন্ন গিয়াছে। ইউরোপের বণিক ও দোকানদারেরা কলজাত বিলাস সস্তায় বেচিয়া বহুলোকের অনিষ্ট করিতেছে। তাহারা যে ইহা জানে না বা বুঝে না এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই। কিন্তু তাহারা চায় টাকা। ক্রেতার অনিষ্ট অমঙ্গলের ভাবনা তাহারা ভাবিতে পারেই না, ভাবিতে তাহাদের প্রবৃত্তিই হয় না। তাহারা উন্নত না অবনত?

ক্রেতা আহ্বান করিবার অভিপ্রায়ে ইউরোপের দোকানদারেরা কি রূপ বিজ্ঞাপন বাহুল্য করে সকলেই জানেন। সেই সকল বিজ্ঞাপনে সত্যকথা যেমন নিক্তির ওজনে ঠিক করিয়া লেখা হয় এমন বোধ হয় আর কুত্রাপি হয় না। সেই সকল বিজ্ঞাপনে ঔষধ মাত্রই অব্যর্থ, সর্ব্বরোগ নাশক, লক্ষ লক্ষ লোক কর্ত্তৃক প্রশংসিত, চিকিৎসক ও চিকিৎসা শাস্ত্রের কল্পনাতীত—অমুক রোগের যত ঔষধ আবিষ্কৃত

হইয়াছে তন্মধ্যে অমুক ঔষধ গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দরে সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা, সেবনে আশু পরলোকপ্রদ। এই রূপ যে জিনিসই বিজ্ঞাপিত হয় তাহার তুল্য জিনিষ ত্রিভুবনে আর নাই, তেমন সস্তা জিনিসও আর নাই, তাহার গুণের সংখ্যা হয় না, তাহার উপকারিতার সীমা নাই, তাহা জগদ্বিখ্যাত, তাহা সমস্ত জগদ্বাসী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ও প্রশংসিত, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করিয়া আমরা নিজে কত ঠকিয়াছি, অপরে কত ঠকিয়াছে, কত লোকে ঠকিতেছে ও ঠকিবে বলা যায় না। এত মিথ্যা কথা কহিয়া অর্থোপার্জ্জন করা উন্নতির লক্ষণ না অবনতির লক্ষণ? মিথ্যা পরিচয়ে লোককে প্রতারিত করিয়া তাহাদের অর্থাপহরণ করা উন্নতি না অবনতি? ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন ভারতে কখন ছিল না, এখন হইয়াছে। এমনই হইয়াছে যে লজ্জায় ঘৃণায় ইউরোপের কাছেও আমাদের আর মুখ তুলিবার যো নাই। হিন্দুর উন্নতি ইউরোপের উন্নতিও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

অর্থের জন্য ইউরোপ লোককে কেবল মিথ্যাকথায় প্রতারিত করেন না, বিপুল বুদ্ধিতে বিচিত্র বিধানে রচিত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়াও ফেলেন। গা মাজিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য পূর্ব্বে এ দেশে মাটি, খৈল, সফেদা, বড় জোর দুধের সর ব্যবহৃত হইত। এখন কদাচিৎ কোথাও ছোট ছেলের গায়ে দুধের সর মাখান হয়,

নহিলে সাবানেরই এখন পূর্ণ প্রভুত্ব। তাহাত হইবারই কথা। সাবান যদি অমনি একটা সাদা বা কাল চাপড়ার মত হইত তাহা হইলে উহার আদর আধিপত্য হইত না। কিন্তু ইউরোপ যে বিচিত্র ছাঁচের বিচিত্র বর্ণের সুবাসিত সাবান প্রস্তুত করেন তাহা দেখিলে পেটে না খাইয়াও উহা কিনিতে ইচ্ছা হয়, আর কিনিয়া প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে সময়ে অসময়ে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বিশ ত্রিশবার না মাখিয়া না শুঁকিয়া না ছুঁইয়া থাকা যায় না। আর এমন সাবানে শরীরের রং ফলাইয়া কেশবিন্যাস বেশবিন্যাসাদি যেমন তেমন হইলে চলে কি? ইউরোপকে এ কথা বলিয়া দিতে হয় না। ইউরোপ আপন পার্থিব বুদ্ধিতেই বেশ বিন্যাসের এমন বিপুল বিচিত্র চিত্তবিহ্বলতাকারী উপকরণ পাঠাইয়া দিতেছেন যে ভারতের মেয়ে পুরুষে দিনে দশ বার টয়লেট টেবিলে না বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না। এক একবার টয়লেটে এক একটা যুগ কাটাইয়া দিতেছে। টয়লেটের অতি সামান্য ত্রুটীতে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতেছে—নিখুঁত টয়লেটে চতুর্বর্গ প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক চরিতার্থতা লাভ করিতেছে। ইউরোপ কত বিচিত্র চিঠির কাগজ ও খাম প্রস্তুত করিয়া চারিদিকে ছড়াইতেছেন সকলেই দেখিয়াছেন। সেই সকল কাগজ ও খামের রং ও চাকচিক্যাদিতে মুগ্ধ হয় না এমন বালক বালিকা যুবক

যুবতী কমই আছে। সুতরাং বালক বালিকা যুবক যুবতীদের মধ্যে চিঠি লেখালিখির বেজায় ধূম পড়িয়া গিয়াছে। না পড়িবেই বা কেন ? শুদ্ধ অমন কাগজে চিঠি লিখিয়া অমন খামে পূরিয়া পাঠাইবার লোভে বনগমনের বয়স অতিক্রম করিয়াছেন পলিতকেশ স্খলিতদন্ত বৃদ্ধেরও বোধ হয় আর একবার 'আশনাই' করিবার চেষ্টা করিবার ইচ্ছা হয়। ইউরোপ এইরূপে মানুষকে আরো কত জিনিস দিয়া কতই প্রলুব্ধ করিতেছেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না। মানুষকে মজাইয়া মারিয়া টাকা করিবার জন্য ইউরোপ বিধাতার বসুন্ধরাকে একটা চমক্‌চৈতন্যাপহারিণী কুহকিনী করিয়া তুলিয়াছেন। ইউরোপ বড় উন্নত।

টাকার জন্য ইউরোপ ইহার অপেক্ষাও অধম কার্য্য করিতেছেন। আমার একবার কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথে যাইবার প্রয়োজন হয়। সঙ্গে ভৃত্য লইতে পারিলাম না। ১০ ঘণ্টা রেলগাড়িতে থাকিতে হইবে, যাত্রাকালে তাম্রকূটের কথাটা একবার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু তখনই বলিলাম, না হয় নাই হইবে, দশ ঘণ্টা বৈত নয়। আমার এক আত্মীয় সে কথা শুনিলেন না—তাঁহার দেহটা আপাদ-মস্তক তাম্রকূটে রচিত—তিনি জোর করিয়া আমার পকেটে একটা দেশলাইয়ের বাক্‌স এবং একটা পাখীর চোকের চুরুটের বাক্‌স পূরিয়া দিলেন। ও রকম চুরুট আমি পূর্ব্বে কখন খাই নাই। অপরাহ্নে শীতের শীতল বায়ু যখন আরো

শীতল হইয়া আসিল, ঈষৎ রক্তাভ রৌদ্র একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িল, সুদীর্ঘ শকটশ্রেণী যেন কিছু কষ্টে পাহাড় পরিবেষ্টিত তরঙ্গায়িত মালভূমি কাটিয়া চলিতে লাগিল তখন মনে হইল একটা পাখীর চোখের সহিত আলাপ করিয়া একটু অন্যমনস্ক হই না কেন। চুরুটের বাক্স খুলিয়াই দেখি, একফোঁটা কাগজে একটী অপূর্ব্ব নারী মূর্ত্তি। তখন বঙ্গের বালক মহলে আজ কাল পাখীর চোখের যে বিষম উপদ্রব হইয়াছে তাহার একটা তথ্য বুঝিলাম,আর বুঝিলাম টাকার জন্য ইউরোপ অবাধে অকুণ্ঠিত ভাবে মহোল্লাস সহকারে মনুষ্য মধ্যে ঘোর দুষ্প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া বেড়াইতে-ছেন। ইউরোপের দুষ্কৃতির অতি সামান্য নিদর্শনের উল্লেখ করিলাম। তদপেক্ষা ভীষণ নিদর্শন খুঁজিলেই পাওয়া যায়। কিন্তু খুঁজিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইউরোপ উন্নত না অবনত ?

আর এক কথা। পার্থিব পথকে মুখ্য পথ করিলে পৃথিবীকে সামলাইয়া উঠা যায় না। পৃথিবীতে থাকিতে হইলে পার্থিব পথ একবারে পরিহার করা অসম্ভব। মানুষের খাদ্য আবশ্যক, পরিচ্ছদ আবশ্যক,বাসগৃহ আবশ্যক, ইত্যাদি। এই সমস্তের নিমিত্ত যাহা যাহা করিবার প্রয়োজন তাহা করিলে মানুষের উন্নতি হয়, না করিলে অবনতি হয়। ঐ নদীর পরপারস্থ গ্রাম হইতে চাল না আনিলে তোমার খাওয়া হয় না। সাঁতারিয়া নদী পার হইতে প্রাণহানির সম্ভাবনা।

সুতরাং সেতু নির্ম্মাণে তোমার উন্নতি। যাহার সমুদ্র-পার হইতে আহার্য্য বা পরিধেয় আনিতেই হইবে জাহাজ নির্ম্মাণে তাহার উন্নতি *। এরূপ উন্নতি ইউরোপের বেশ হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপ এরূপ উন্নতি আবশ্যক মত করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই। এক সময়ে ইউরোপের বাষ্পীয় পোত বা কলের জাহাজ ছিল না। তখন পালভরে জাহাজ যাইত। সে জাহাজ কলের জাহাজের ন্যায় নিরাপদও ছিল না দ্রুতগামীও ছিল না। তাহাতে গমনাগমনে প্রাণহানি ও বিলম্ব দুইই বেশী হইত। ইউরোপ কলের জাহাজ করিয়া গমনাগমন সম্বন্ধে একটা উন্নতি করিলেন বটে, কিন্তু গমনা-গমনের যে সময় টুকু কমাইলেন তাহা ধর্ম্মচিন্তায় বা সৎকর্ম্মে অর্পণ না করিয়া আর একটা কল কারখানার কাজে নিয়োজিত করিলেন। এইরূপে পার্থিবতার কুহকে ইউরোপকে এমন অনেক কার্য্য করিতে হইতেছে যাহা না করিলে জীবন কোন অংশে অসার্থক হয় না এবং এমন অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইতেছে যাহা জীবনধারণার্থ অপরিহার্য্য নহে। বস্ত্রাদি নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী কলে

* যে দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও অভাবাদি যেরূপ সে দেশের বাহ্য উন্নতি তদনুযায়ী হওয়াই উচিত। তদতিরিক্ত বাহ্য উন্নতিতে পারলৌকিক উন্নতির ব্যাঘাতের সম্ভাবনা। ইউরোপের তাড়নায় আজ পৃথিবীর সকল দেশকেই যে ইউরোপের ন্যায় বাহ্য উন্নতি করিতে হইতেছে ইহার অপেক্ষা অনিষ্ট ও অমঙ্গল পৃথিবীতে আর কখন ঘটে নাই।

প্রস্তুত হইয়া সস্তা হইল্। কিন্তু লোকে ঐ সকল সামগ্রী সস্তায় কিনিয়া টাকা বাঁচাইয়া তদ্দ্বারা দুইটা সৎকর্ম্ম করিতে পারিল না। প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে যেমন তাহাদের কিছু বাঁচিল অমনি কতকগুলা অনাবশ্যক সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া তাহাদের সঞ্চিত টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। এইরূপে ইউরোপ কত অনাবশ্যক সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন তাহার সংখ্যা হয় না। ইউরোপ যেন একটা পৃথিবীর ভিতর দশটা পৃথিবী ঠাসিয়া ফেলিয়াছেন—ইউরোপ যেন একটা জগৎযোড়া মালগুদাম হইয়া পড়িয়াছে। কল কৌশলের উন্নতি বশতঃ লোকে অনেক কাজ দিন দিন স্বল্পতর সময়ে করিতে পারিতেছে। রেলে যে পথ যাইতে আগে আধঘণ্টা লাগিত এখন তাহাতে কুড়ি মিনিটের বেশী লাগে না। কিন্তু রেলপথে এই যে দশ মিনিট বাঁচিতেছে ইহা সৎকর্ম্মে দেওয়া হইতেছে না—আপিসে বা দোকানে বা কারখানায় বা হোটেলে বা ঘোড়দৌড়ে বা ক্রিকেটে বা শৌণ্ডিকালয়ে দেওয়া হইতেছে। এই সমস্ত কারণে ইউরোপকে পার্থিব কাজে ক্রমে এত বেশী বেশী শক্তি সামর্থ্য ও সময় দিতে হইতেছে যে বোধ হয়, কৌচ কেদারায় চাকা দিলে ঐগুলা টানিতে ঘুরাইতে ফিরাইতে যে সামান্য শক্তি ও সময় বাঁচে ইউরোপ যেন তাহাও না বাঁচাইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। এইরূপই ত হইবার কথা। পৃথিবীকে অনুধাবন করিলে, পৃথিবী লইয়া থাকিলে,

পৃথিবীকে সামলাইয়া উঠা যায় না। একটা পার্থিব পদার্থ পাইলে, আর একটা পাইবার ইচ্ছা হয়, সেটা পাইলে, আরো একটা পাইবার ইচ্ছা হয়—এইরূপে যতই পাওয়া যায় পাইবার ইচ্ছা ততই বাড়ে। শেষে এত আসিয়া পড়ে যে তাহাদের বেগ সম্বরণ করা যায় না, তাহাদের চাপে মানুষ অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন সেই গুলাই মানুষের সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে—সেই গুলার জন্য মানুষ পাগল হয়। তখন পদার্থের মধ্যে আবশ্যক অনাবশ্যক, পরিহার্য্য অপরিহার্য্যের প্রভেদ থাকে না—যাহা নহিলে নয় তাহাও যেমন আবশ্যক মনে হয়, যাহা নহিলে জীবনধারণের কোন ব্যাঘাত হয় না তাহাও তেমনি আবশ্যক মনে হয়। তখন যে পার্থিবতা হইতে পৃথিবীর এই প্রাদুর্ভাব তাহা আরো প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে এবং মোহাভিভূত মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া কেবলই পৃথিবীর পথে ছুটিতে থাকে। ইউরোপের এখন এই অবস্থা। ইউরোপ কেবলই ছুটিতেছে—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে।

কিন্তু পৃথবীর পথে এত ছুটিয়াও ইউরোপের সুখ স্বস্তি সন্তোষ কিছুই হইতেছে না। বরং অসুখ অস্বস্তি অসন্তোষই বাড়িতেছে। ইউরোপ পৃথিবী লইয়া এত মুগ্ধ,এমনি উন্মত্ত, যে সেই অসুখ অস্বস্তি ও অসন্তোষকেই আপন উন্নতির মুল কারণ বলিয়া সগর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত লোককে বুঝাইয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এই অসুখ

অস্বস্তি ও অসন্তোষ হইতে ইউরোপের যে উন্নতি হইতেছে তাহা কি প্রকার উন্নতি একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। পার্থিব লালসায় ইউরোপের অনেক জাতি রাজ্যবিস্তারে বিলক্ষণ মনোযাগী। কিন্তু রাজ্য বিস্তার করিয়া কোন জাতিই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। তৃপ্তিলাভ করিবার উপায় যে নাই। লালসায় লালসা বাড়িয়াই যায়, কমে না ত। রাজ্যলালসা যত বাড়িতেছে, ইউরোপের রাজ্য লোলুপ জাতিদিগের মধ্যে অসদ্ভাবের ততই বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মাণ, রুষ ইহারা কেহ কাহাকে দেখিতে পারে না, ইহারা পরস্পরের সম্বন্ধে মুখে যতই মিষ্ট কথা কহুক, মনে মনে বিষম গরল পোষণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্যই আজ সমস্ত ইউরোপ সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, এবং সামরিক শক্তি বাড়াইবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিতেছে। রাজ্যলালসা যত বাড়িবে ইউরোপের রাজ্যলোলুপ জাতিগণের মধ্যে অসদ্ভাব ও অসুখ ততই বৃদ্ধি হইবে। শেষে এক দিন ইউরোপে এমন সমরানল প্রজ্বলিত হইবে যে ইউরোপ, ইউরোপেররাজ্য, ইউরোপের জাতি সমূহ সমস্তই তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। অর্থলালসা সেই মহানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে। কারণ ইউরোপের জাতি সমূহের মধ্যে রাজ্য লইয়াও যেমন ঈর্ষ্যা ও অসদ্ভাব বাণিজ্য লইয়াও ঠিক তেমনি। যে উন্নতি হইতে মনুষ্য মধ্যে এত ঈর্ষ্যা ও অসদ্ভাব উৎপন্ন হয় এবং

যে উন্নতির চরম ফলস্বরূপ পৃথিবীতে এক মহাপ্রলয় অবশ্যম্ভাবী তাহাকে উন্নতি বলা উচিত বিবেচনা কর, বল, কিন্তু অবনতি বলিতে যাহা বুঝায় তাহাকেও তাহা হইলে উন্নতি বলিতে হইবে।

এখন ইউরোপের লোকসাধারণের কথা বলি। পার্থিব লালসায় ইহারা নিত্য নূতন ভোগ্য বস্তু চাহিতেছে। কাল যে বস্তুকে ইহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া আদর করিয়াছে আজ তাহা অপকৃষ্ট বলিয়া ফেলিয়া দিয়া উৎকৃষ্টতর ভোগ্যের জন্য লালায়িত হইতেছে। এই কারণে ইউরোপে অসুখ, অসন্তোষ, অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা, অস্থিরতা প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। তাহাদের ভোগ্য বস্তুর ভাবনা অপর সমস্ত ভাবনা ছাপাইয়া উঠিয়াছে, ভোগ্য বস্তুর বাসনা অপর সমস্ত বাসনা অপেক্ষা প্রবল হইয়াছে। এইরূপ বাসনায় মানুষ যেমন দুরন্ত ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে, বোধ হয় আর কিছুতেই তেমন হয় না। তাই ইউরোপের লোকসাধারণের নিমিত্ত তথাকার রাজা, রাজমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা, ব্যবস্থাপকসভা প্রভৃতি সমস্ত শাসকমণ্ডলী সদাই শঙ্কিত ও শশব্যস্ত, অনেক সময় নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিতেও বাধ্য। লোকসাধারণকেও এইরূপ বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শাসকমণ্ডলীর উপর অত্যধিক নির্ভর করিতে হইতেছে। আমদানি রপ্তানি ক্রয় বিক্রয় কলকারখানাদি বিষয়ক বিধিব্যবস্থা যাহাতে

তাহাদের সুবিধাজনক হয় এই ভাবনায় তাহারা আকুল। তাই তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার সময় হয় না; কিন্তু সংবাদ-পত্রে পার্লেমেণ্ট প্রভৃতি সভার কার্য্য বিবরণ না পড়িলে তাহাদের পিত্তরক্ষাও হয় না, দিনগত পাপক্ষয়ও হয় না। এ দেশ হইতে কেহ কেহ তাহাদের দেশে গিয়া আমাদের নিন্দা ও তাহাঁদের প্রশংসা করিয়া বলিয়া থাকেন যে তথায় মুটে মজুর গাড়োয়ান পর্য্যন্ত প্রতিদিন মহা আগ্রহ সহকারে সংবাদপত্র পাঠ করে। কথাটা সত্য বটে। তাহাদের প্রশংসার কথা হউক আর নাই হউক, কথাটা এত সত্য যে মুটে মজুর গাড়োয়ান প্রভৃতির জন্য তাহাদের পরমহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ রাজমন্ত্রীদিগকেও পদচ্যুত হইতে হয়। সুতরাং বুঝা যাই-তেছে যে তাহাদের পার্থিব বাসনা যতই প্রবল হইতে থাকিবে তাহাদের শাসনকার্য্য ততই কঠিন ও দুর্নীতিদূষিত হইয়া বিপদসঙ্কুল হইবে এবং বাসনার অতৃপ্তিতে বিষম অসুখী ও অশান্ত হইয়া তাহারা সমস্ত ইউরোপীয় সমাজকে হয়ত সমগ্র মানবকুলকে বিপন্ন করিয়া ফেলিবে। ভোগেই ভোগের নাশ, পার্থিবতাই পার্থিবতার কণ্টক—লোকচরিত ও ইতিহাস উভয়ত্রই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে।

যাহারা বাসনায় বিহ্বল, বাধাবিঘ্ন ব্যতিরেকে পূর্ণমাত্রায় বাসনার পরিতৃপ্তি করা যাহারা জীবনের একটা বড় উদ্দেশ্য মনে করিয়া উদ্দামভাবে আপনাদিগকে ভোগের পথে প্রধাবিত করে, তাহারা যেমন অন্ধ তেমনি স্বাধীনতা-

হীন। অন্ধের পথ যেমন বিপদসঙ্কুল তাহাদের পথও তেমনি। অন্ধও যেমন পথে কোথাও পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলে, কোথাও ধাক্কা পাইয়া মাথা ফাটায়, কোথাও কাহারও ঘাড়ে পড়িয়া তাহার গুরুতর আঘাত ঘটায়, তাহারাও তেমনি পথ চলিতে চলিতে আপনারাও কত বিপদে পড়ে, পরকেও কত বিপদে ফেলে। উদাহরণ দ্বারা একথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা নাই। বাসনাবিহ্বল হইলে লোকে যে বাসনাতৃপ্তির উপায়াদি সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে ইহা কেহ কখন অস্বীকার করিতে পারে নাই এবং পারিবে না। বাসনায় যাহারা জ্ঞানশূন্য তাহারা করিতে না পারে এমন কাজ নাই, ঘটাইতে না পারে এমন ঘটনা নাই, তাহাদের সমাজ অগ্নিকুণ্ডবৎ—বাসনারূপ অনলে সে ভীষণ কুণ্ড সদাই প্রজ্বলিত —সে কুণ্ডাগ্নিতে তাহাদের পুড়িয়া মরিবার কথা, সে কুণ্ডাগ্নির হল্‌কা যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে তাহাদেরও পুড়িয়া মরিবার কথা। লোকে বলে তাহারা বড় স্বাধীন। হিন্দুদিগের ন্যায় তাহারা বিদেশীয় রাজার অধীন নয় বটে, তাহাদের আপনাদের রাজা বা শাসকসম্প্রদায় তাহাদের চলা ফেরা আহার বিহার আমোদ আহ্লাদ পড়াশুনা বেচা কেনা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের ইচ্ছা স্বেচ্ছা মতি গতির এতটুকু সঙ্কোচসাধন করিবার চেষ্টা বা উদ্যোগ করিলে তাহারা বিদ্রোহী পর্য্যন্ত হইয়া উঠে সত্য। কিন্তু প্রকৃত

স্বাধীনতা যাহাকে বলে তাহা তাহাদের নাই। যে পৃথিবীর মোহে মুগ্ধ, পার্থিব বাসনায় বিহ্বল, তাহার আপনার উপর আপনার আধিপত্য নাই, সে নিজে নিজের রাজা নয়। সে নিতান্ত পরাধীন—পৃথিবীতে তাহার মত ক্রীতদাস আর নাই। লোভ মোহ বাসনা তাহাকে যাহা করায় আপত্তির নামটী পর্য্যন্ত না করিয়া সে তাহাই করে। সে জ্ঞান-পরিচালিত নহে, বাসনাবিতাড়িত। বাসনার বৃদ্ধি বা অতৃপ্তিতে সে অসুখী, অশান্ত, দুর্দ্দান্ত। সে নিজেই নিজের শত্রু—রাজশক্তিরও অনায়ত্ত। সে আপনিই আপনার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা অসুখ অসন্তোষের সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না, রাজা বা রাজশক্তির সাধ্য কি যে তাহার দুঃখ কষ্ট ঘুচায়। তাহাদেরই একজন কবি বলিয়াছেন—

"How small, of all that human hearts endure,
That part which laws or kings can cause or cure"

বাসনাবিতাড়িতেরা দেখিতে দুই দিন সজীব সতেজ সমারোহসম্পন্ন হইলেও প্রকৃত পক্ষে ধ্বংসাভিমুখী, প্রলয়পন্থী। বাসনাধিক্যে বিপদ ও বিনাশের বীজ নিহিত থাকিবেই থাকিবে। বাসনার নিবৃত্তি বা প্রশমন ব্যতিরেকে সে বীজেরও বিনাশ নাই। সহস্র বৎসরে হউক, দুই সহস্র বৎসরে হউক সে বীজ হইতে

বিনাশের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপ দুই দিনের—উহার ইতিহাস দুই মুহূর্ত্তের। কিন্তু ইহারই মধ্যে বোধ হইতেছে যেন উহার ভবিষ্যৎ বড় ভয়ঙ্কর। ইউরোপে বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, বহির্বিজ্ঞান আছে, বিবেচনা আছে, দূরদৃষ্টি আছে, মহত্ত্ব আছে, পুরুষত্ব আছে। কিন্তু যদি বিধাতার কোন নিগূঢ় নিয়মে ইউরোপের বাসনানিহিত বিনাশের বীজ বিনষ্ট হয় তবেই উহার মঙ্গল। নচেৎ উহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা, বিজ্ঞান, মহত্ত্ব, পুরুষত্ব সমস্তই এক দিনের বিষম ব্যাপারে বিলুপ্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। গ্রীস রোমের বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনা মহত্ত্ব পুরুষত্ব শক্তি সামর্থ্য সবই ছিল। কিন্তু কিছুতেই উহাদের বিনাশরোধ হয় নাই। উহারাও যে আজিকার ইউরোপের ন্যায় বাসনানলে জ্বলিত।

এখন বোধ হয় বুঝাগেল যে ইউরোপ যে পথে চলিতেছেন তাহা কেবল যে ইউরোপের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং পরকালের প্রকৃতি বিবেচনায় কুপথ তাহা নহে; যে পার্থিব সুখসমৃদ্ধির জন্য সে পথ অবলম্বন করা হইয়াছে সে পথ সে পার্থিব সুখসমৃদ্ধিরও প্রকৃত পক্ষে প্রতিকূল। সুতরাং সে পথ ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের মঙ্গলার্থই সমস্ত মানবকুলের পক্ষে অপ্রশস্ত অনিষ্টকর ও অনবলম্বনীয়। অনেকে বলেন যে বহুপূর্ব্বকালে যে পথই মনুষের শ্রেয় হইয়া থাকুক মানবের বর্ত্তমান

অবস্থায় ইউরোপের অবলম্বিত পথ আর ছাড়িলে চলে না। কারণ মানুষের পার্থিব অভাব পূর্ব্বকালে অতি অল্পই ছিল, এখন অসংখ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং অভাব মোচন পূর্ব্বকালে যেমন সহজসাধ্য ছিল এখন তেমনি দুঃসাধ্য হইয়াছে। মানুষের অভাবের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু যত বাড়িয়াছে তত বাড়িবার কথাত নয়। মানুষের নিজের নিজের অভাবের হেতু পূর্ব্বেও যে রূপ ছিল এখনও প্রায় সেইরূপ আছে। পূর্ব্বেও মানুষের যেমন একটা শরীরে একটা মাথা, একটা পেট, দুইটা হাত, দুইটা পা ছিল এখনও ঠিক তাহাই আছে। পূর্ব্বে মানুষকে একটা পেটের খাদ্য, একটা দেহের বস্ত্র, দুইটা পায়ের জুতা সংগ্রহ করিতে হইত আর এখন দুইটা পেটের খাদ্য, দুইটা দেহের বস্ত্র, চারিটা পায়ের জুতা সংগ্রহ করিতে হয় এমন নহে। তথাপি অনেকে বলেন যে মানুষের অভাবের সংখ্যা বড়ই বাড়িয়াছে। কিন্তু যত বাড়িয়াছে সকলই যে অনিবার্য্য কারণে বাড়িয়াছে তাহা নহে। নিরাপদে নদী পার হইতে পারিবার জন্য সেতু একটী ন্যায্য অভাব। সমুদ্র পার হইতে যতদূর সম্ভব নিরাপদে পেটের অন্ন আনিতে পারিবার জন্য কলের জাহাজ একটী ন্যায্য অভাব। কিন্তু যত জিনিষ এখন মানুষের অভাব বলিয়া গণ্য হয় সকলই কি এমনি ন্যায্য অভাব? তুমি পূর্ব্বে কেবল তামাক খাইতে, এখন আবার চা, চুরুট, কাফি প্রভৃতিও খাইতেছ। যখন কেবল

তামাক খাইতে তখন কি তোমার শরীর ভাল থাকিত না আর এখন তামাকের উপর চা চুরুটাদি চড়াইয়া কি ব্যাধিমুক্ত হইয়াছ? ফল কথা, মানুষের নিজের নিজের প্রকৃত অভাব বেশী বাড়িবার কথাই নয়, বাড়িয়াছেও অতি অল্প, কিন্তু যাহা না হইলেও চলে ভোগলালসা বাসনানুবর্ত্তিতা প্রভৃতির দোষে তাহা নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়া পড়ায় প্রকৃত অভাব স্বরূপ অনুভূতও হইতেছে, গণ্যও হইতেছে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য, লোকালয় সকলের গঠন প্রণালীর পরিবর্ত্তনের জন্য এবং অন্যান্য কারণে মানবজাতি বা সমাজের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই। একলক্ষ লোকের জন্য যত খাদ্য উৎপাদন বা সংগ্রহের প্রয়োজন এককোটী লোকের জন্য তদপেক্ষা অনেক অধিক খাদ্য আবশ্যক। অত বেশী খাদ্য উৎপাদনার্থ ব্যয়ও অনেক বেশী করিতে হয়, সম্ভবতঃ উৎপাদনের প্রণালীও নূতন রকম করা আবশ্যক হইতে পারে। এইরূপ কারণে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে কল কারখানা একরকম অভাব স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃত অভাব মোচনার্থ যত কলকারখানা আবশ্যক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সকল দেশের লোকে ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। যাহা প্রকৃত অভাব নহে, যাহা ব্যতীত মানুষের জীবন ধারণের কি সর্ব্বপ্রকার মানসিক উন্নতির কোন ব্যাঘাত হয় না, এমন অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও তাহারা কল

কারখানা করিয়াছে। ✓কলকারখানা করিয়া পার্থিব সুখ সম্পদ বাড়াইবার অভিপ্রায়ে বহির্বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে এইরূপই হইয়া থাকে। কলকারখানার দেশে বহির্বিজ্ঞান অভাব বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ—যাহা অভাব নয় তাহাকে প্রকৃত অভাব করিয়া তুলিবার একটী প্রবল হেতু। ✓কাল-সহকারে মানব-সমাজের বিস্তৃতি প্রভৃতি যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তদ্ধেতু প্রকৃত অভাব বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু এত বাড়ে নাই, এত বাড়িতে পারেও না যে মানুষকে ভাবিয়া আকুল হইতে হয়, খাটিয়া খাটিয়া মৃতকল্প হইতে হয়, অথবা সেই চিন্তায় পরকালের চিন্তা উড়াইয়া দিতে হয়। যাহা অভাব নয় পৃথিবীর মোহে তাহাকে অভাব করিয়া তুলিয়া অনেকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাব মোচন করিব, না, পরকালের ভাবনা ভাবিব? অভাবমোচন কি জন্য পূর্ব্ব কালের অপেক্ষা কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য হইয়াছে তাহা কতকটা বুঝা যাইতেছে। যাহা না হইলে মানুষের চলে এবং যাহাতে মানুষের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয় এমন বহুতর সামগ্রী অভাবস্বরূপ হইয়া উঠায় সর্ব্ব প্রকার অভাবমোচনই এক্ষণে এত অধিক শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর হইয়াছে। আহার্য্য, পরিধেয়াদি না হইলে চলে না। লোকসংখ্যাদি বৃদ্ধি হইলে এই সকল সামগ্রী সংগ্রহ করাও কিছু কষ্টকর হইয়া থাকে বটে।

কিন্তু যে সকল সামগ্রী না হইলে চলে সেই সকল সামগ্রীকে আহার্য্যাদির ন্যায় অপরিহার্য্য করিয়া তুলিলে আহার্য্যাদি সংগ্রহ করাও যে বড় বেশী পরিমাণে কষ্টকর হইয়া পড়ে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনকার দিন কাল বড় hard (শক্ত), struggle for existence (জীবন রক্ষা করা) বড় ভয়ানক হইয়াছে—এই যে সকল কথা এখন শুনিতে পাওয়া যায়, এই সকল কথা ইউরোপ হইতে আসিয়াছে। অর্থাৎ যেখানে স্বাভাবিক বা প্রকৃত অভাব ও কৃত্রিম অভাব সমান হইয়া পড়িয়াছে সেইখান হইতে আসিয়াছে। এবং সেইখান হইতে আসিয়া এই সকল কথা এখানেও কথিত হইতেছে। কারণ এখানেও স্বাভাবিক বা প্রকৃত অভাব এবং কৃত্রিম অভাব সমান হইয়া উঠিতেছে। মানুষের যদি কৃত্রিম অভাব না থাকে এবং ইহকাল অপেক্ষা পরকালের প্রতি বেশী দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে আহার্য্যাদির জন্য তাহাকে বিব্রত ব্যতিব্যস্ত বা বিপন্ন হইতে হয় না। যীশু খৃষ্ট বলিয়াছেনঃ—

Therefore take no thought, saying, What shall we eat ? or, What shall we drink ? or, Wherewithal shall we be clothed ?

For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself.

(মেথিউ, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৩১ হইতে ৩৪)।

যীশুখৃষ্ট মানুষকে আহার্য্যাদি সংগ্রহ সম্বন্ধে অলস, অসাবধান, অবহেলাপরায়ণ, উদাসীন বা অপরিণামদর্শী হইতে পরামর্শ দিতেছেন না। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে, পরমেশ্বর যাহার প্রধান লক্ষ্য এবং স্বভাব যাহার ধর্ম্মপরায়ণ, অন্ন বস্ত্রের জন্য সে ভাবে না বলিয়া, অন্ন বস্ত্রাদিতে তাহার প্রাণ পড়িয়া থাকে না বলিয়া, অন্ন বস্ত্রে তাহার অতি অল্পে, অতি সহজে পরিতৃপ্তি হয়, সুতরাং তাহার অন্ন বস্ত্র স্বল্পায়াসেই জুটে। অন্ন বস্ত্রের জন্য তাহাকে পৃথিবী লুটিয়া বেড়াইতে হয় না, রাজাকে মারিয়া রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়া পৃথিবী মানবশোণিতে প্লাবিত করিতে হয় না। অন্ন বস্ত্র যেমনই হউক তাহাতেই তাহার মনের তুষ্টি, এবং মনের তুষ্টিতেই তাহার শরীরে শক্তি। অন্ন না পাইলে সে কাহাকেও কিছু বলে না, না বলিয়া পরকালপ্রয়াসী হিন্দুর ন্যায় নিঃশব্দে পরমেশ্বরের

নির্দ্দিষ্ট পরলোকে চলিয়া যায়*। তাহার ন্যায় নির্ম্মলচিত্ত, নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব লোক পৃথিবীতে আর নাই। সে যত সহজে আপনার দ্বারা আপনি শাসিত হয় আর কেহ তত সহজে হয় না। সে যত সহজে রাজা দ্বারা শাসিত হয় আর কেহ তত সহজে হয় না। এই জন্যই কি স্বদেশীয় রাজা কি বিদেশীয় রাজা হিন্দুর ন্যায় শান্ত, সহজে শাসিত প্রজা কেহ কখন কোথাও পায় নাই। আপনার সম্বন্ধেই বল আর রাজা অথবা রাজশক্তির সম্বন্ধেই বল, সে যেমন স্বাধীন আর কেহই তেমন নহে। স্বদেশীয় রাজা হারাইয়া আর সকলেই মরে। রাজা স্বদেশীয়ই হউক আর বিদেশীয়ই হউক, হিন্দু মরিতে জানে না। অভাব কম হইলে ও সহজে মোচন করিতে পারা গেলেই পরের উপর নির্ভর করিবার আবশ্যকতা কমে, নচেৎ কমে না। কিন্তু অভাব কমাইবার ও সহজে মোচন করিবার একমাত্র উপায় ইহকালকে পরকালের অধীন করা, পার্থিবতা পরিহার পূর্ব্বক ঈশ্বরপরায়ণতা প্রবল করা। যীশুখৃষ্ট এই কথাই বলিয়াছেন। ইউরোপ তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইয়া রাজশক্তি ও রাজকার্য্যের এতই অধীন হইয়া পড়ি-

---

* অন্নকষ্টে হিন্দু আজ কাল লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে। ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। হিন্দু বুঝি বিকৃত হইতেছে। বড় ভয়ের কথা।

য়াছে যে তথায় লক্ষ লক্ষ লোকের বাইবেল খানা বৎসরে একবার না খুলিলেও চলে কিন্তু মুটে মজুরটারও প্রতিদিন একখানা সংবাদপত্র না পড়িলে চলে না। আর ইউরোপের একটু বাতাস পাইয়া এদেশেও অনেকে রাজশক্তির উপর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভর করিতেছে এবং সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক আন্দোলন মানুষের পরম পদার্থ মনে করিতেছে।

অভাবমোচন সম্বন্ধে আর একটী প্রয়োজনীয় কথা আছে। লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অন্যান্য স্বাভাবিক বা অনিবার্য্য কারণ বশতঃ মানুষের প্রকৃত অভাবের বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—(১) ইউরোপের পথে না গেলে চলিবে কেন ? (২) এবং ইউরোপের পথে যদি যাইতেই হয়, তাহা হইলে সে পথে কত দূর গিয়া থামিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিবার উপায় কি ? এই দুইটী প্রশ্নের মধ্যে প্রথমটীর উত্তর দিলে বোধ হয় দ্বিতীয়টীর উত্তরের প্রয়োজন হইবে না। ইউরোপের পথে না গেলে চলিবে কেন—এ প্রশ্নের উত্তর এই যে প্রকৃত অভাবের বৃদ্ধি বশতঃ পার্থিব বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হওয়াকে ইউরোপের পথে যাওয়া বলে না। অর্থলালসায় ও ভোগলালসায় পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হওয়াকেই ইউরোপের পথে যাওয়া বলে। প্রকৃত অভাব মোচনার্থ পার্থিব বিষয়ে যতই

মনোযোগী হইতে হউক, তাহাতে দোষ নাই, ধর্ম্মহানি নাই, অধোগতি নাই, মানবপ্রকৃতির বিকৃতি নাই। বরং যত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক তত মনোযোগী না হইলে ধর্ম্মহানি আছে, পাপ আছে, অধোগতি আছে। কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে পার্থিব বিষয়ে হিন্দুর পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগী হওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যত মনোযোগী হওয়া আবশ্যক হইয়াছে হিন্দুর চিরন্তন মানসিক প্রকৃতি বিবেচনায় হিন্দু তত মনোযোগী হইতে পারিবে কি না, অর্থাৎ ইউরোপ যেমন পরকাল পরমেশ্বর সমস্ত ভুলিয়া পার্থিব বিষয়ে প্রাণপাত্ করিতেছে হিন্দু সেরূপ করিতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ আছে। হিন্দু যদি সে রূপ করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার পার্থিব অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, জয় পরাজয় জীবন মৃত্যু যাহাই থাকুক, কি মানুষ কি দেবতা কেহই তাহাকে নিন্দা করিতে পারিবে না, অপরাধী করিতে পারিবে না, প্রত্যবায়ভাগী করিতে পারিবে না। ইউরোপের পক্ষে যাহা সম্ভব বা সুসাধ্য অপর সকলের পক্ষেই তাহা সম্ভব বা সুসাধ্য হইবে, এমন কোন কথাই নাই—ইউরোপ যাহা উন্নতি মনে করেন অপর সকলকেই তাহা উন্নতি মনে করিতে হইবে, বিধাতার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বিধানও নাই। সুতরাং আবার বলি, অনিবার্য্য কারণে হিন্দুর পার্থিব অবস্থায়

আজ যে পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে তাহার জন্য হিন্দু যদি আপন মহতী প্রকৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়া ইউরোপের পথে ইউরোপের ন্যায় ছুটিতে না পারে, তাহা হইলে মানুষের কাছে তাহার যাহাই হউক, বিধাতার কাছে কোন অপরাধই হইবে না।) আর ইউরোপের পথে ইউরোপের ন্যায় ছুটিতে না পারিবার জন্য তাহার যদি মৃত্যু ঘটে—মৃত্যু ঘটিবে না, মৃত্যু ঘটিতে পারিবে না, তাহা জানি—কিন্তু ধরা যাউক যদি মৃত্যুই ঘটে তাহা হইলে সে বড় গৌরবের মৃত্যু হইবে। কিন্তু এ কথাও বলিতে হইবে—একবার নয়, দুইবার নয়, সহস্রবার বলিতে হইবে—হিন্দুর পার্থিব অবস্থার পরিবর্ত্তন যখন ঘটিয়া পড়িয়াছে তখন পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ যে সকল নূতন অথচ প্রকৃত অভাব উপস্থিত হইয়াছে সেই সমস্তের মোচনার্থ হিন্দু যদি পার্থিব বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা না করে তাহা হইলে যথার্থই তাহার ধর্ম্মহানি হইবে, সে দেবতার কাছে অপরাধী হইবে, মনুষ্য মধ্যে হেয় হইবে।

প্রথম প্রশ্নের এই যে উত্তর দেওয়া হইল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ইহার মধ্যেই নিহিত আছে। পার্থিব পথে গিয়া কোথায় থামিতে হইবে, এ কথার উত্তর, এই যে, প্রকৃত অভাব মোচনার্থ যত দূর যাওয়া আবশ্যক, তত দূর গিয়াই থামিতে হইবে। তুমি বলিবে, ইউরোপ ত তত দূর

গিয়া থামিতে পারে নাই, তদপেক্ষা অনেক বেশী দূর গিয়াছে। কথা সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষ পার্থিব অভাব ও সম্পদের প্রতি চিরকালই যে কম মনোযোগী ছিল তাহা নহে। প্রাচীন ভারতে লোকসংখ্যা, রাজ্যপাট, সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে প্রাচীন হিন্দুও তেমনি পার্থিব অভাব ও সম্পদের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইয়াছে। বাল্মীকির সরযূতীরবর্ত্তী অযোধ্যা নগরীর বর্ণনায় পার্থিব উন্নতি ও ঐশ্বর্য্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় শতদ্রুতীরবাসী হিন্দুর সে পার্থিব উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য ছিল না। কাল সহকারে হিন্দু কত নূতন নূতন শিল্প আবিষ্কার করিয়া কাল সহকারে তাহাতে কতই উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন কি প্রয়োজনানুসারে বিলাসের উপকরণ পর্য্যন্ত কতই যে হইয়াছিল এবং কি অপরূপ ও অতুলনীয়ই যে হইয়াছিল তোমাকে আমাকে তাহা বলিতে হইবে না, সমস্ত পৃথিবী তাহা সহস্রমুখে বলিয়া থাকে। তথাপি হিন্দু ত কখনই পার্থিব হইয়া যায় নাই। হিন্দু ত ইউরোপের ন্যায় পার্থিব পথে প্রয়োজনের অধিক প্রবেশ করে নাই। হিন্দু বিলাসের উপকরণ গড়িয়াছিল বটে। কিন্তু গরীব মজে, গরীব মরে এমন করিয়া গড়ে নাই। গরীব ও নিম্নশ্রেণীর নিমিত্ত বিলাসের উপকরণ গড়িতে নাই, তাহার জ্ঞান এবং শিক্ষাও এইরূপ ছিল। অতএব পার্থিব পথে প্রয়োজনানুসারে

গমন করিয়া যে থামিতে পারা যায় হিন্দুই তাহার প্রমাণ। ফল কথা, পার্থিব পথে চলিবার সময়ও যদি পরলোকের উপর প্রধান লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে হিন্দুর ন্যায় সকলেই ঐ পথে আবশ্যক মত অগ্রসর হইয়া ক্ষান্ত হইতে পারে, বোধ হয় ক্ষান্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। পরলোকের উপর প্রধান লক্ষ্য থাকিলে মানুষের পার্থিব বাসনা বলবতী হইতে না পারায় পার্থিব অভাব বেশী বাড়ে না এবং সেই জন্য পার্থিব পথে বেশী দূর যাইবার আবশ্যকতাও হয় না। পরলোকের পথ ধরিলে পার্থিব পথের সীমা বা দৈর্ঘ্য আপনা আপনিই নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়ে, নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য কষ্ট পাইতে বা বিব্রত হইতে হয় না।

কঃ পন্থাঃ ?—এই প্রশ্নের যেরূপ ও যতটুকু আলোচনা এস্থলে আমার সাধ্যায়ত্ত তাহা করিয়া দেখিলাম যে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পরকালের প্রকৃতি বিবেচনায় ভারতের পথ ত উৎকৃষ্ট পথ বটেই; অধিকন্তু প্রয়োজনীয় বা অনিবার্য্য পার্থিব অভাব মোচনের পক্ষে ঐ পথ অন্তরায় ত নহেই প্রকৃত পক্ষে শ্রেয়ঃ পথ। অন্য দিকে দেখা গেল যে ইউরোপের পথ অর্থাৎ পার্থিব পথ কেবল যে প্রকৃত উন্নতির বিরোধী তাহা নহে, পার্থিব সুখশান্তি সম্পদেরও প্রতিকূল। সুতরাং ভারতের পথই পথ। সেই পথ অবলম্বন করিয়া হিন্দু আপনাকে পৃথিবীর

মধ্যে একমাত্র প্রকৃত মহাজন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতএব বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডবকুলের জীবন মরণের সমস্যা স্থলে যক্ষের প্রশ্ন কঃ পন্থাঃ ? ইহার উত্তরে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যেমন বলিয়াছিলেন—

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

যুধিষ্ঠিরের সময়ের বহু সহস্র বৎসর পরে কেবল হিন্দুকুলের নয় সমস্ত মানবকুলের জীবন মরণের কথা প্রসঙ্গে আমাদের নিজের উত্থাপিত কঃ পন্থাঃ ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকেও তেমনি বলিতে হইল—

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

কিন্তু প্রশ্নের উত্তরের মূল্য সম্বন্ধে একটু কথা আছে। যিনি যক্ষের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন তিনি মানবকুলে এক মহাপুরুষ—আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিতেছি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমরা। যুধিষ্ঠিরের উত্তর মহামূল্য—আমাদের উত্তরের মূল্য কি ? এ কঠিন প্রশ্নের উত্তর কি দিব জানি না। বোধ হয় এ প্রশ্নের উত্তর নাই। তবে এই কথাটী মনে হয় যে স্বয়ং বিধাতা বুঝি আমাদের অনুকূল পক্ষে আছেন—কঃ পন্থাঃ ? এই প্রশ্নের যে মীমাংসায় আমরা উপনীত হইয়াছি মানব জাতির ইতিহাসে তিনিই বুঝি ইহারই মধ্যে তাহার প্রমাণ পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন আসিরিয়া, ফিনিসিয়া, গ্রীস, রোম, পারস্য, আধু-

নিক স্পেন, বিনিস প্রভৃতি মহা পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের বিলুপ্তিতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, পার্থিব বাসনানলে প্রজ্বলিত হইয়া পরকালকে ইহকালের অধীন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য ; আর ভারতের অপরিসীম অস্তিত্বে তিনি দেখাইয়াছেন যে ইহকালকে পরকালের অধীন করিয়া বিষম বাসনানল নির্ব্বাপিত করিতে পারিলে মৃত্যু অসম্ভব। আর পৃথিবীর মহামোহে মুহ্যমান বাসনানলে দগ্ধপ্রাণ ইউরোপের এই দুর্দ্দিনেও যে তথাকার কোন কোন নরনারী ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব—বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্বই হউক আর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মতত্ত্বই হউক—ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব এবং ভারতের বাসনাবিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইতেছেন ইহাও বোধ হয়, বিধাতারই ইঙ্গিত, যে ইউরোপের লক্ষণ বড় ভয়ানক বটে, কিন্তু ইউরোপ যখন ভারতের পথ দেখিতে শিখিতেছে তখন সে বাঁচিবে। বিধাতার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মৃত্যু অপেক্ষা জীবনই প্রবল। যে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে যাইতেছে বিধাতা তাহাকেও এই রকম করিয়া বাঁচান। আমাদের উত্থাপিত 'কঃ পন্থাঃ' এই প্রশ্নের 'মহাজনোযেন গতঃ স পন্থাঃ' এই যে উত্তর লাভ করিয়াছি, ইহা আমাদের উত্তর নয়, বিধাতা সমস্ত মানবকুলের অদৃষ্টে যে উত্তর লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং এখনও ইঙ্গিতে লিখিতেছেন ইহা সেই উত্তর

১

পরলোকপন্থী হইলে—

(ক) মানব প্রকৃতির রোক, ঝোঁক, তীব্রতা, উগ্রতা, ব্যগ্রতা, জটিলতা, কুটিলতা, দুর্দ্দমনীয়তা, ভোগ-পরায়ণতা প্রভৃতি কমিয়া যায়। সুতরাং

(খ) মানুষের রাজনৈতিক শাসন সহজ হইয়া পড়ে। এবং

(গ) মনুষ্য মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যুদ্ধ বিগ্রহের কারণও কম হয়।

(ঘ) খাদ্যাদির নিমিত্ত মানুষের পশ্বাদির ন্যায় পরস্পরকে ধ্বংস করিবার প্রবৃত্তি কমিবার ফল স্বরূপ Struggle for existence, অর্থাৎ, জীবনরক্ষার চেষ্টা, সহজ হয়, এবং Survival of the fittest অর্থাৎ কৌশলী বা বলবানদিগেরই বাঁচিয়া থাকা উচিত এইরূপ নির্ম্মম পশুকুলোচিত সংস্কার ও মতবাদ সকল চলিয়া যায়।

২

ইউরোপ পরলোকপন্থী হইলে—

(ক) ইহলোকপন্থীদিগের নিমিত্ত পরলোকপন্থীদিগের এখন যে সঙ্কট অনিষ্ট ও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে তাহা আর ঘটিবে না।

(খ) ইউরোপের জাতি সকলের মধ্যে এখন যে অসূয়া অসম্ভাবাদি আছে তাহা আর থাকিবে না।

(গ) ইউরোপে মানব প্রকৃতির বিষম রোক, ঝোঁক, তীব্রতা, উগ্রতা, ব্যগ্রতা, জটিলতা, কুটিলতা, দুর্দ্দমনীয়তা প্রভৃতি কমিয়া যাইবে। স্নুতরাং

(ঘ) ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি স্নিগ্ধতা ও সরলতা বিরাজ করিতে থাকিবে। এবং

(ঙ) ইউরোপীয় সাহিত্যের আয়তন, আস্ফালন, আড়ম্বর, অত্যাচার, অসারতা, অনিষ্টকারিতা প্রভৃতি কমিয়া যাইবে। ইউরোপের এত যে লেখালেখি বকাবকি হুড়াহুড়ি তাহাও স্বল্পতম হইয়া পৃথিবী ঠাণ্ডা হইবে এবং মানুষ শান্ত হইয়া সচ্চিদানন্দের সেবায় ও সাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থাবলী

শকুন্তলাতত্ত্ব	১।০
ফুল ও ফল	৸০
ত্রিধারা	১৲
হিন্দুত্ব	১৷৷০
পশুপতি সংবাদ	৵০
কঃ পন্থাঃ	।৵০
গার্হস্থ্য পাঠ	।/০
গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি	৵০
প্রথম নীতি পুস্তক	৶০
নূতন পাঠ	৶০